দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১৫ ডিসেম্বর - ২০১৪।। ২৮ অগ্রহায়ণ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

সার্ক সম্মেলনে ভারতের সাফল্য

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' ভরসা বাড়ছে, ভারত এগোচ্ছে

....পৃ: ২৭

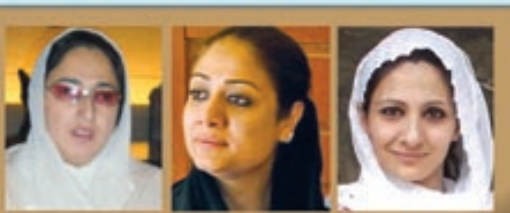

উপত্যকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারাই

....পৃ: ২৯

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৫ ডিসেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : বান্ধু মানে বাঁশ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

চোরের মায়ের বড় গলা— কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের খরচের হিসাব দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনও রাজধর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১১

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পূর্বদিকে সফর ও সার্ক সম্মেলন ▯ মে: জে: কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অ: প্রা:) ▯ ১৩

পাক-দৌরাত্ম্য রুখে সার্ক দৌত্য ভারতের ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৭

কোয়েনার্ড এলাস্টের চোখে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টদের হিন্দু বিদ্বেষ ▯ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী ▯ ২০

চক্রতীর্থ নৈমিষারণ্য ▯ তরুণ কুমার পণ্ডিত ▯ ২১

দেশপ্রেম ও ইসলাম বন্দনার সমন্বয়সাধক নজরুল ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

ভরসা বাড়ছে, ভারত এগোচ্ছে ▯ মুজফ্‌ফর হোসেন ▯ ২৭

উপত্যকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারাই ▯ ২৯

মরণোত্তর দেহদানের সচেতনতা বাড়লে বহু মানুষ নতুন জীবন পাবে ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
২২ ডিসেম্বর
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ ডিসেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

৫০-এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

এবছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন সেবা ও সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে পরাবর্তন, শ্রীরামমন্দির নির্মাণের মতো আন্দোলনাত্মক কাজ পরিষদ করে চলেছে। এককথায়, আমাদের জাতীয় জীবনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এবারের বিষয় তাই--- ৫০-এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। লিখেছেন--- **দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক স্বরূপ ঘোষ, ডা: শচীন সিংহ প্রমুখ।**

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন নয়, রাজনৈতিক তরজা চান মুখ্যমন্ত্রী

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আচার আচরণ এবং জিদের জন্য রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের উন্নয়ন নিরানব্বই শতাংশ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে নিতান্তই প্রলাপ বাক্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। উন্নয়নের গল্প শুনাইয়া বামফ্রন্ট বিদায় লইয়াছে, তৃণমূলও বিদায় লইবার অপেক্ষায়। রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই সচেষ্ট হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ইহাই প্রচলিত নিয়ম। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোয় জনগণের ভোটে দুইটি পৃথক দল কেন্দ্র এবং রাজ্য শাসন করিতেই পারে। দুই দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হইলেও উন্নয়নের প্রশ্নে কেহই ব্রাত্য নহে। কিন্তু যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে খামখেয়ালিপনা থাকিবেই। তাঁহার নিকট রাজ্যের উন্নয়নের অপেক্ষাও নিজের জিদ ও হঠকারিতার প্রাধান্যই বেশি। আর এই জন্যই রাজ্যের উন্নয়ন-স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি যাইলেন না। অথচ প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্যা ও উন্নয়নের স্বার্থেই এই বৈঠক ডাকা হইয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত থাকিলে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুলিয়া ধরিতে পারিতেন। বর্তমানে রাজ্য চরম আর্থিক সঙ্কটে ভুগিতেছে। দেনায় ডুবিতেছে রাজ্য। দিন দিন ঋণের জালে জর্জরিত হইতেছে। সম্প্রতি পুনরায় বাজার হইতে হাজার কোটি টাকা ঋণ করিবার মনস্থ করিয়াছে তৃণমূল সরকার। বিগত বামসরকার অধিক ঋণ করিয়া রাজ্যের অর্থনৈতিক সর্বনাশ করিয়া গিয়াছিল, ক্ষমতায় আসিয়া তৃণমূল সরকার সেই ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদটিকেই ধ্বংস করিয়া দিতেছে। আগামীদিনে যাহারা ক্ষমতায় আসিবে তাহাদের জন্য ফোঁপড়া অর্থনীতি রাখিয়া যাইবে এই সরকার। তৃণমূল সরকার বুঝিয়া গিয়াছে আগামীদিনে তাহারা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিতে পারিবে না, তাই রাজ্যটিকে ধ্বংস করিবার প্রস্তুতি লইতেছে। একদিকে উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইতেছে, অন্যদিকে বাজার হইতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঋণ লওয়া চলিতেছে। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই সরকারের তৈরি বাজেট। যে বাজেটে শুধুমাত্র হিসেব বহির্ভূত খাতেই ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে ধার্য করা হইয়াছে প্রায় একত্রিশ হাজার কোটি টাকা। যাহাকে এক কথায় ভূ-ভারতে রেকর্ড বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা।

আসলে রাজ্যের স্বার্থে রাজনৈতিক মতাদর্শকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সার্বিক উন্নতির কথা বলিতেছেন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ পৃথক হইলেও তিনি যাবতীয় সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সাহায্য লইতে ইচ্ছুক নন বলিয়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত হন নাই। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক মত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কারণ তাঁহার লক্ষ্য রাজনৈতিক তরজা নয়; রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন। বস্তুত এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক তরজা-লড়াই। কেন এই তরজার লড়াই?

তৃণমূলদলের নেত্রী রাজনীতির চাইতে 'টাউটারি' বেশি পছন্দ করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন হইল তিনিই একাই একাধারে নায়ক, দর্শক এবং সমালোচক থাকিবেন। তাঁহার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না, কারণ সমালোচনা তিনি পছন্দ করেন না। তিনি সবসময় চান নিত্য সবাই তাঁহার গুণগান করুক। যদিও এসব রাজতন্ত্রে সম্ভব, গণতন্ত্রে নয়। তিনি চাহিয়াছিলেন লোকসভার ভোটে তিনিই কিং মেকার হইবেন, সরকার বানাইবেন, সারা ভারতবর্ষে দালালি করিয়া বেড়াইবেন। সেইসব সম্ভব হয় নাই বলিয়াই তাঁহার এতো গোঁসা। ভাগ্যের উপর রাগ করিয়া রাজ্যকে রসাতলে পাঠাইতে তাই এই তরজা।

সুভাষিত

ক্রোধো মূলমনার্থানং ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্মক্ষয়করঃ ক্রোধঃ তস্মাৎ ক্রোধং বিবর্জয়েৎ।।

ক্রোধ সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ। ক্রোধ সংসারবন্ধনের কারণ, ক্রোধ ধর্মনাশকারী। এজন্য ক্রোধ ত্যাগ করা উচিত।

বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠনের ছক জামাতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ থেকে তিনজন ও ভারত থেকে একজন রোহিঙ্গা মুসলমান গ্রেপ্তার হয়। এই গ্রেপ্তারের ঘটনাকে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হিমশৈলের চূড়ামাত্র বলে মনে করছেন বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তে নামা গোয়েন্দারা। মায়ানমারের নাগরিক খালেদের গ্রেপ্তারের পরে মানচিত্র ও অন্যান্য যে তথ্য-প্রমাণাদি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-র হাতে এসেছে। তাতে বাংলাদেশ ও হায়দরাবাদ থেকে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, জলপাইগুড়ির একাংশে এবং বাংলার সীমান্ত এলাকার মাদ্রাসাগুলিতে বৃহত্তর চক্রান্তের গন্ধ স্পষ্ট হচ্ছে। তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যাচ্ছে জঙ্গি মডিউলগুলি মূলত বাংলার জেহাদিদের 'বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ' গঠনের কাজে ব্রেনওয়াশের জন্য ব্যবহৃত হোত। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) আমলে— ১৭৫০ খৃস্টাব্দে যে রাজত্ব বিস্তৃতি ছিল তাকেই মাপকাঠি করা হয়েছে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের। অর্থাৎ এর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কিছু অংশও থাকছে।

এন আই এ সূত্র বলছে, প্রাথমিকভাবে জেহাদিরা পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলাকে কব্জা করার পরিকল্পনা করেছিল। জেলাগুলি হলো মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা। পাশাপাশি বাংলাদেশের চারটি জেলা— রাজসাহী, কুষ্টিয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ ও সাতক্ষীরা এবং নিম্ন অসমের একাংশও তাদের লক্ষ্যের তালিকায় ছিল। তদন্তকারী আধিকারিকরা আরো জানাচ্ছেন গত পয়লা ডিসেম্বর ঢাকা থেকে ত্রিমূর্তি— নূর হোসেন ওরফে রফিকুল ইসলাম, ইয়াসির আরাফত এবং উমর করিমকে গ্রেপ্তার করার পর জেরার মুখে তারা স্বীকারও করেছে জামাত-উল-মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করতে তাদের এই অ্যাজেন্ডাকে কাজে লাগাচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এন আই এ আরো সাতজনকে খুঁজছে। যদিও 'বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ' গঠনের এই ধারণা নতুন নয়।

২০০৮-এ ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামি লিগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে নতুন উদ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয় সন্ত্রাসবাদীরা। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআর-এর জওয়ানদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার মধ্যে জামাত, হুজি (হরকত উল জেহাদি ইসলামি)-এর মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির হাত দেখেছিলেন গোয়েন্দারা। এই বিদ্রোহের এমনই ব্যাপকতা ছিল যে বহু বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিক এবং উচ্চস্তরের পুরো সেনা-বিন্যাসটি (ঢাকার বাংলাদেশ রাইফেলসের মুখ্যকার্যালয়ে প্রায় ৫৭ সেনা আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন), বি ডি আর-এর নির্দেশক (ডিজি) সহ হত্যা করা হয়। এন আই এ-র আধিকারিকদের দাবি, ১০০-রও বেশি জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গা জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকেছে যাদের সম্বন্ধে ভারত কিংবা বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর খুব কমই ধারণা রয়েছে।

এই আই এ-র এক আধিকারিকের বক্তব্য, বাংলাদেশ সরকার জঙ্গিদের খুঁজতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করার পর জঙ্গিসংগঠনগুলির তাবড় নেতারা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ও দেশের অন্যত্র অনুপ্রবেশ করে এবং তারা এখনো ভারতেই রয়েছে। সূত্র বলছে, মায়ানমারের রাখাইন জেলা থেকে এখনো পর্যন্ত আসা সমস্ত রোহিঙ্গাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোহিঙ্গারা মূলত জনজাতি সম্প্রদায়ের এবং স্বল্প-শিক্ষিত। মায়ানমার থেকে বৌদ্ধরা তাদের পরিত্যাগ করার পর রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের খোঁজে বাংলাদেশে আসা ছাড়া অন্য বিকল্প খুব কমই ছিল। জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গাদের জঙ্গিপনায় ব্যবহার করে।

বাবরি-মামলার মুসলমান ফরিয়াদি-ই চাইছেন রামলালার মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের বাইশতম বার্ষিকীর ঠিক দিনতিনেক আগে রামজন্মভূমি-বাবরি ধাঁচা মামলার অন্যতম ফরিয়াদি হাসিম আনসারি ঘোষণা করলেন তিনি এই মামলা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন এবং ওই তথাকথিত বিতর্কিত এলাকায় রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে সওয়াল করছেন। গত ৩ ডিসেম্বর তিনি জানান : 'এই বিষয়টি-র রাজনীতিকরণ হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ও নেই। তাই আমি এই মামলা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতে চাইছি এবং লিখিতভাবে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েওছি। আগামী ৬ ডিসেম্বর তাই কোনো প্রতিবাদ অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করছি না। ওইদিন বাড়িতেই থাকব।' হাসিম আরও জানিয়েছেন— 'আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ আজম খানের মতো রাজনীতিকরা বিষয়টি জটিল করে তুলেছেন।' পাশাপাশি এও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন : 'আমি চাই তাঁবু থেকে রামলালার মূর্তি ওই স্থানে নির্মিত একটি বড়ো মন্দিরে অধিষ্ঠান করুন।' রাম-জন্মভূমি-বাবরি ধাঁচা মামলার দুই বাদী-বিবাদী ছিলেন হিন্দুসন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস ও তিরানব্বই বছরের আনসারি। রামচন্দ্র দাস আগেই প্রয়াত হয়েছেন।

প্রতি বছর ঘটা করে ৬ ডিসেম্বর যাঁরা 'সংহতি দিবসে'র নামে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-কে অস্বীকার করে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে ঘটা করে অনুষ্ঠান করেন হাসিম আনসারির ঘোষণায় তাঁদের মুখোশ খুলে গেল বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। এখন আনসারির এই বক্তব্যের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার।

উত্তর ভারতেও এ আই এম আই-এর জাল বিস্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সম্প্রতি মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে তিনজন জয়লাভ করায় এবার অন্যান্য রাজ্যকেও পাখির চোখ করেছে তারা। মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতেও তারা রাজনৈতিক জাল বিস্তার করতে চলেছে। এর আগে ডিসেম্বর ২০১৩-তে দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনেও তারা সামিল হতে চেয়েছিল। কিন্তু দলীয় নেতা আকবরুদ্দিন ওয়াইসি জাতীয়তাবিরোধী মন্তব্য করায় প্রশাসনের লালচক্ষুর সামনে পড়তে হয় তাদের। তখন তারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। উত্তরপ্রদেশ-দিল্লীর পাশাপাশি তারা পা বাড়াচ্ছে এবার কর্ণাটকের দিকেও। এ প্রসঙ্গে দলের সুপ্রিমো আলাউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, লক্ষ্ণৌতে তারা দলীয় কার্যালয় খুলছে এবং আজমগড়ে একটি সভাও করবে। লোকসভা ভোটের আগে তারা তা করতে চাইলেও প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় শেষে তাদের নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করতে হয়। দিল্লীর উর্দু দৈনিক 'ইনকিলাব' সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে। এ আই এম আই এম— নামে এই রাজনৈতিক দলটি ১৯২৭ সালে নবাব নওয়াজ খানের হাত ধরে চালু হয়। হায়দরাবাদের শেষ নিজাম মীর ওসমান আলির নির্দেশে নওয়াজ খান এ আই এম আই এম প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বাধীন হায়দরাবাদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর ১৯৩৮ সালে বাহাদুর ইয়ারজঙ্গ দলের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে দলটি গাঁটছড়া বাঁধে। তার কিছু পরে হায়দরাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে সরকার এই দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেও গোপনে দলের কাজ চলতে থাকে। অবশেষে হায়দরাবাদ পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বেশ কিছু আসনে তারা জয়লাভও করে। সালাউদ্দিন ওয়াইসি ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পরবর্তীকালে তার ছেলে আসাদুদ্দিন ওয়াইসিও ২০০৪ ও ২০১২-এর নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে তাদের দলেরই এক সদস্য মহম্মদ সাজিদ হুসেন হায়দরাবাদের মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গেও শরিক দল হিসাবে যোগদান করে। ২০১২ নভেম্বর-এ আসাউদ্দিন ওয়াইসি ও তার দল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে। ২০০৯-এ হায়দরাবাদ পৌরসভা নির্বাচনে এই দল ৪৩টি আসনে জয়লাভ করে। তারপর থেকে তাদের আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এক সময় মহারাষ্ট্রের পৌরসভাও তারা দখল করে। এছাড়াও কর্ণাটকের পৌরসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬টি আসনে জয়লাভ করে এই জাতীয়তা-বিরোধী দল। বর্তমানে তারা তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির শরিকদল হিসাবে রয়েছে। তবে আর যাইহোক, অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন দলটি প্রথম দিন থেকেই কিছু না কিছু বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এরকমই ২০০৭ সালে বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন হায়দরাবাদে বই উদ্বোধনে গেলে এই দলের কর্মীদের হাতে তাঁকে নিগৃহীতা হতে হয়। পুলিশ অভিযুক্ত তিনজন দলীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে সেই মামলা আদালতে বিচারাধীন। আসলে এই দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা। এবার একের পর এক রাজ্যে তারা জাল বিস্তার করে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে এই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

মালদা জেলায় লাভ জেহাদ বাড়ছে

সংবাদদাতা : মালদা॥ মালদা জেলাতে 'লাভ জেহাদে'র প্রকোপ অনেক দিন থেকে পড়লেও সম্প্রতি এর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ইংলিশবাজার, কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া প্রভৃতি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ফেরিওয়ালা, রাজমিস্ত্রি এবং কলেজছাত্ররা গৃহবধূ এবং ছাত্রীদের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে বিয়ে করছে এবং পরে ধর্মান্তরিত করছে। গত ২৪ নভেম্বর এমন একটি লাভ জেহাদের ঘটনায় জনরোষে ৫টি সন্তানের পিতা মোহফিল শেখ (৪২) অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা খুন হয়। ঘটনার সূত্রপাত মাস ছয়েক আগে। এই মোহফিল শেখের একটি পুকুর রয়েছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হরেকৃষ্ণ কোঙার কলোনিতে। পাশের গ্রাম কমলাবাড়ি থেকে পুকুর দেখতে এসে হরেকৃষ্ণ কোঙার কলোনির তিন সন্তানের মা সবিতা বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং পরে ফুসলিয়ে তাকে বিয়ে করে। বিয়ের আগে সবিতাকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অনেকবার সাবধান করে এবং থানায় বিস্তারিত জানিয়ে ডাইরি করে। বিয়ের ঘটনা জানাজানি হতেই আবার থানায় ডাইরি করা হয় কিন্তু মহিলা বিয়েতে রাজি থাকায় কিছু করা যায়নি। এরপর সবিতা বিশ্বাসকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

গত ২৪ নভেম্বর নিজের পুকুর থেকে কিছু দূরে মোহফিল শেখের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সবিতা বিশ্বাসের শ্বশুরকে এছাড়াও গ্রামের নিরপরাধ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রতিদিন পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে এবং গ্রামের সবাইকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাচ্ছে। বর্তমানে হরেকৃষ্ণ কোঙার-কলোনি পুরুষশূন্য। এদিকে দুষ্কৃতীদের হুমকিতে গ্রামের মানুষরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। পাশের গ্রাম থেকে দুষ্কৃতীদের হামলার আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষজন। গ্রামের পাশে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসলেও গ্রামবাসীর অভিযোগ, গ্রামে মুসলমান দুষ্কৃতীদের যাতায়াত এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দু যুবকদের ধরার জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। মেয়েদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। বিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়াতে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। তারা বিদ্যালয় যেতে ভয় পাচ্ছে।

অবৈধ পোস্ত চাষে রেকর্ড করল কালিয়াচক

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার 'কালিয়াচক' অপরাধ জগতের বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর এবার অবৈধ পোস্ত চাষে নতুন করে রেকর্ড করতে চলেছে। কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে এবার রেকর্ড পরিমাণ জমিতে পোস্ত চাষ হচ্ছে বলে বি এল আর ও সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু হাজার হাজার বিঘে জমিতে পোস্ত চাষ হলেও প্রশাসন কী করছে এই প্রশ্নে প্রশাসনের উদাসীনতার দিকেই সকলে আঙুল তুলছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গত বছর যে সব জমিতে পোস্ত চাষ হয়েছিল এবং পুলিশ প্রশাসন লোকদেখানো কিছু পোস্ত নষ্ট করেছিল, সেই জমির মালিকদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, তাদের নামে কোনো মামলা দায়ের করাও হয়নি। প্রশাসনের এই ব্যর্থতার সুযোগে আইন বিরুদ্ধ পোস্ত চাষ করার ঝুঁকি নিতে সাহস দেখাচ্ছে চাষিরা।

ঘটনা হলো, এই পোস্ত চাষের ক্ষেত্রেও ৯০ শতাংশই মুসলমান চাষি। প্রশাসন এই সব চাষিদের কোনো শাস্তি না দেওয়ার জন্য এ বছর রেকর্ড পরিমাণ জমিতে পোস্ত চাষ করা হয়েছে। যদিও প্রতি বছর শুল্ক বিভাগ থেকে পোস্তগাছ নষ্ট করার অভিযান চালিয়ে থাকে। সূত্রে জানা গেছে, এবছরও ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে অভিযান শুরু হবে। কিন্তু পোস্ত চাষের প্রবণতা কমবে কী? পোস্ত চাষি জামাল শেখ, এজাজুল হক, সারিফুল ইসলামরা জানিয়েছে, কম সময়ে অত্যন্ত লাভজনক ও পোস্ত খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ফুল ফুটলেই শুরু হয় পোস্ত আঠা সংগ্রহ। এক বিঘে জমিতে কম করে ৫ কেলোগ্রাম আঠা সংগ্রহ হয়, চোরাবাজারে ১ কেলোগ্রাম আঠার দাম এক লক্ষ টাকারও বেশি। ভাল চাষ হলে এক বিঘে জমিতে ১০ কেলোগ্রামও আঠা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লাভের পরিমাণও অনেক বেশি।

এই পোস্ত আঠা থেকে সর্বনাশা যে সব মাদক দ্রব্য তৈরি হয় তা যে যুবসমাজকে বিপথে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার দিকে কারো নজর নেই। এই পোস্ত আঠা থেকে মারাত্মক ধরনের নেশার দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। এমনকী পোস্তর খোসাগুলিও মাদক হিসাবে ৩-৪ শো টাকা কিলোগ্রাম দরে বিক্রি হচ্ছে। যেহেতু ৩-৪ মাসের মধ্যেই এই পোস্ত চাষ শেষ হয়ে যায় এবং এতে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা তাই ঝুঁকি নিয়েও বেআইনি এই চাষ চলছে জেলাজুড়ে। কালিয়াচক ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফারহানা খাতুন, সহ সভাপতি সেলিম আলি, কালিয়াচক ৩নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শরিয়াতুল ইসলাম প্রমুখ এই অবৈধ পোস্ত চাষের বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও আবগারি বিভাগের ওপর দায়ভার চাপিয়ে নিজেরা ভার মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। যদি ফুল ফোটার আগে পোস্ত গাছগুলি নষ্ট করা না হয় তবে তার পরিণতি যে ভয়াবহ হবে তাতে সন্দেহ নেই। গত বছর বৈষ্ণবনগরে পোস্ত জমির মালিকদের সঙ্গে পোস্ত গাছ নষ্ট করা নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল। কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসন যদি জনসাধারণকে সচেতন করতে না পারে তা হলে এবং পোস্ত চাষ বন্ধ না করা যায় তবে আগামীদিনে কলিয়াচক আরও অন্ধকার জগতের মধ্যে ডুবে যাবে। আবগারি বিভাগ, বিডিও-রা এবং বি এল আর ও যৌথ ভাবে এই অবৈধ পোস্ত চাষ নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এটাই চাইছেন।

বাম্বু মানে বাঁশ

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

না, কোনও দিদিকে নয়, এই চিঠি আমাদের এই রাজ্যের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া আপনাকে। আমি আপনার গুণগ্রাহী এক বঙ্গবাসী। আপনার গুণের সীমা নেই। একই সঙ্গে আপনার মতো মাটির মানুষ সত্যিই এই মাটির পৃথিবীতে কম আছে। আপনি শিল্পপতির, আপনি সুদীপ্তর, আপনি হাইরাইজের, আপনি বস্তির। সর্বত্রই আপনার বিচরণ। কিন্তু আপনি যে সত্যিই তৃণমূলের প্রাণ তা আপনার কালো মাটির কাছাকাছি ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আপনার মুখের যে ভাষা আপনি শুনিয়েছেন তাতে মানতেই হয়, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। আপনি সত্যিই উত্তর আর অধমে কোনও ফারাক রাখেননি। বাম্বু মানে যে বাঁশ তা আপনি নতুন করে বুঝিয়েছেন। স্ল্যাং মানে কুকথার অভিধানে বাঁশের যে অর্থ বর্ণনা করা আছে তা আপনি রীতিমতো অভিনয় করে হাতের মুদ্রার মাধ্যমে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা সর্বজনবোধ্য। একেবারে ছেলেমানুষরা বোঝেনি অবশ্য। অনেকের মনে হয়েছে মুদ্রাটি বড্ড পুরুষোচিত। অবশ্য আপনার পুরুষকার নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকাও উচিত নয়। যেভাবে একটি দল ও একটি রাজ্যের আপনি হর্তা-কর্তা-বিধাতা তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথাই নয়। অবশ্য কথায় কথায় ধর্ষণকে 'সামান্য ঘটনা' আখ্যা দেওয়াটা সত্যিই পুরুষোচিত না কাপুরুষোচিত তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

এতদিন মনে করা হোত শুধু শিক্ষিত, মার্জিত সমাজের মানুষেরাই রাজনীতির মতো মহান কর্তব্য পালন করবেন। কিন্তু হে মুখ্যমন্ত্রী, আপনি সে নিয়ম ভেঙে দিয়ে যুগান্তকারী বার্তা দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, মার্জিত মানুষের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে রাজনীতি এখন লুম্পেন সমাজেরও আঙিনায়। এর আগে আপনার হয়ে মনিরুল, আরাবুল, অনুব্রতরা লুম্পেন সমাজের কাছে রাজনীতিকে নিয়ে গেছেন। অভিনেতা সাংসদ বিরোধী রাজনীতির পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করার ইচ্ছা বীরের মতো প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এবার আপনি তৃণমূল কংগ্রেসের তথা রাজ্যের নির্বাচিত সাংবিধানিক শপথ নেওয়া অভিভাবক কুকথায় সিলমোহর দিয়ে দিলেন। আপনাকে সাধুবাদ জানানোর ভাষা পাচ্ছি না। অনেকে মনে করবে শুধু বাঁশ দেওয়ার কথা বলে কী এমন মহান কাজ আপনি করেছেন? তাদের উদ্দেশে বলি, সমঝদারোঁ কে লিয়ে ইসারা হি কাফি হ্যায়। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হাতটি যে ভঙ্গিমায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেড়েছেন তাতেই বোঝা গেছে তৃণমূল স্তরের লুম্পেনদের কালচারের কত কাছাকাছি আপনি থাকেন। কতটা নিবিড়ভাবে সেই ভাষা, সেই ইঙ্গিত প্রকাশের ক্ষমতা রাখেন।

কেউ কেউ আবার বলছে, সবটাই আপনার অভিনয়। তৃণমূল স্তরের লুম্পেনদের প্রতি 'আমি তোমাদেরই লোক' বার্তা দিতেই অমন অঙ্গ সঞ্চালন। তবে আমার মনে হচ্ছে এর উত্তর আছে গোপাল ভাঁড়ের গল্পে। সেই যে একটা গল্প আছে না যেখানে বহু ভাষায় কথা বলা একজনের মাতৃভাষা বুঝতে পারছিলেন না মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। গোপালের শরণ নিতেই সেই বহুভাষিককে অন্ধকারে ল্যাং মারলেন রসিক চূড়ামণি। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় 'ও মাগো' বলে বসলেন বহুভাষিক। আমার মনে হয় আপনিও কোনো বিপদে পড়েছেন। আচমকা বিপদে নিজের ওপর কন্ট্রোলটা নেই। তাই অরিজিনালটা বেরিয়ে পড়েছে।

আপনাকে অভিনন্দন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। যারা বলেন, রোয়াকের ভাষায় শুধু পুরুষের অধিকার তাদের মুখেও আপনি শুধু ঝামা নয়, রীতিমতো স্কচবাইট ঘসে দিয়েছেন। তাই তো আপনার অনুচর শ্রীমান কল্যাণ খিস্তি না হলেও বক্তৃতায় খেউড় শুরু করে দিয়েছেন। আপনাকে খুশি করতে এমন উদাহরণ এখন ঘনঘন পাওয়া যাবে।

যাই হোক, দিল্লীর সরকারটা মানে যে আপনাকে (শব্দটা লিখতে রুচিতে বাধছে) বাঁশ দিচ্ছে তার মাথায় বসে আছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে আপনার অপছন্দ হতেই পারে কিন্তু তিনি আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী। উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। সাধারণের ভোটে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। তবু আপনি তাঁকে এড়িয়ে চলছেন। তাতে অবশ্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নয়, কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজ নিজ রাজ্যের মঙ্গল করছেন। কিন্তু আপনি ইগো-সর্বস্বতা নিয়ে সৌজন্য দূরে থাক প্রধানমন্ত্রীর ডাকে বৈঠকেও যাননি। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনার ভাষাতেই সেই প্রশ্নটা তুলছি।

এসব করে আপনি বাংলাকে বাঁশ
দিচ্ছেন না তো?
না, হাতের ওই অশ্লীল
ইঙ্গিতটা দেখালাম না।

— **সুন্দর মৌলিক**

চোরের মায়ের বড় গলা—কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের খরচের হিসাব দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার

গূঢ়পুরুষের

কলম

বিপ্লব সমাদ্দার। একজন হতদরিদ্র দিনমজুর। আসানসোল মহকুমার একটি প্রত্যন্ত এলাকায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করতেন। গত ছয় মাস ধরে ১০০ দিনের কাজের মজুরি না পেয়ে হতাশায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সংবাদপত্র, টেলিভিশনে প্রতিদিন রাজনীতির চাপান উতোরের খবরের মাঝে বিপ্লব সমাদ্দারের আত্মহত্যা ব্রেকিং নিউজ হয়নি। তাই অনেকেরই হয়তো খবরটা জানা নেই। হয়তো অনেকেই জানেন না যে গত ছয় মাস ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে যুক্ত দিনমজুররা এই রাজ্যে একটি টাকাও পাননি। যথারীতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দুষছেন। কেন্দ্র প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ দিচ্ছে না এই অভিযোগে তিনি গ্রামের মানুষকে শূন্য হাঁড়ি বাজিয়ে মিছিল করার উপদেশ দিচ্ছেন। যে কথাটা তিনি তাঁর মা-মাটি-মানুষকে বলছেন না তা হচ্ছে গত এক বছরের কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের খরচের হিসাব রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। নিয়ম হচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থ খরচের হিসাব জমা না দিলে পুনরায় সেই প্রকল্পে টাকা দেওয়া যায় না। রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা নানা ধরনের উৎসবের এবং পুরস্কার দেওয়াতে খরচ করেছে। কোনো রকম আর্থিক শৃঙ্খলা রাজ্যের তৃণমূল সরকার মানে না। মনে রাখতে হবে যে সারা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই ১০০ দিনের কাজের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ টাকার হিসাবে দেয়নি। তাই সারা দেশে একমাত্র এই রাজ্যে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়েছে। শূন্য হাঁড়ি কলসি বাজালে মিথ্যাচার ঢাকা দেওয়া যায় না। শুধুই ১০০ দিনের প্রকল্পই নয়, এই রাজ্যে খরচের হিসাব না জমা দেওয়ার জন্য প্রায় সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো দিদি ফরমান জারি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ সময় মতো পেতে রাজ্যের প্রশাসনিক আমলারা দিল্লীতে তদবির করতে যাবেন না। অথচ সকলেই জানেন যে লালফিতার ফাঁসে অনেক সময় কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা আটকে যায়। দেশের সব রাজ্যের আমলাই কেন্দ্রীয় দপ্তরে তদবির করেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আদায় করতে। দিদির বক্তব্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে অর্থ ভিক্ষা করতে তাঁর আমলারা যাবেন না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ ভিক্ষা নয়। রাজ্যের অধিকার। আমরা এই অধিকারের দাবি তুলতে পারছি না, কারণ ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা মা-মাটির উৎসবে নয়ছয় করেছি বলে। দিদি দেশের সংবিধান মানেন না। রাজ্যের রাজস্ব বাবদ আয় এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা দিদি তাঁর খেয়ালখুশি মতো খরচ করেন। যেমন, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি ২০ কোটি টাকা উড়িয়ে দিলেন। এই টাকাটা কোন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে খরচ করা হয়েছে তা কেউ জানে না।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'গুড গভর্নেন্স'। স্বচ্ছ জন কল্যাণমূলক প্রশাসন। দিদি মাঝে মাঝেই বড়াই করেন যে রেলমন্ত্রী থাকায় সময় তিনি রেলের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালে রেলদপ্তরের যতটা ক্ষতি করেছিলেন তার ধাক্কা আজও সামলানো যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত সমস্ত রেল প্রকল্প অর্থের অভাবে বন্ধ হয়েছে। মমতার আমলে রেল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল। মমতা একটা কথা বোঝেন যে সবকিছু এলোমেলো করে দাও যাতে তাঁর বশংবদরা লুটেপুটে খেতে পারে। সারদা কেলেঙ্কারিতে যে ছবি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চিটফান্ডের আসল মদতদাতাটিকে। গলাবাজি করলেই চোর সাধু হয় না। কথায় আছে চোরের মায়ের গলার জোর বেশি। মমতাকে একদিন জনতার আদালতে জবাবদিহি করতে হবে কেন তিনি সরকারি নির্দেশ জারি করে বলেছিলেন যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরিতে শুধুমাত্র সারদা চিটফান্ড পরিচালিত সংবাদপত্রই রাখতে হবে। সারদার কাগজ নয় এমন সংবাদপত্র রাখলে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হবে। মমতা নানাভাবে রাজ্যের বিভিন্ন বেআইনি চিটফান্ড সংস্থাকে সরকারি সুরক্ষা দিয়েছেন। চিটফান্ডের স্বার্থরক্ষায় বহু সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ডেলো পাহাড়ে সরকারি অতিথিগৃহে রাত্রে সারদা এবং রোজভ্যালি চিটফান্ডের কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ গোপন বৈঠক করেছেন। কার স্বার্থে? এখন গলাবাজি করে নিজেকে সততার প্রতীক বলে দাবি করে লাভ নেই। রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছেন দইয়ের সরটা কে খেয়েছে। দিদি যতই চিৎকার করে অঙ্গভঙ্গি সহকারে, বলবেন, 'শালারা (বিজেপি) আমাকে বাঁশ দিচ্ছে' ততই জানবেন তাঁর পতন আসন্ন। একথা প্রমাণিত যে দিদিমণির প্রশাসন পরিচালনার দক্ষতা ক্ষমতা কিছুই নেই। তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্রয়ে তাঁর ভায়েরা গুণ্ডামি করতে দক্ষ। মারদাঙ্গা করে প্রশাসন চালানো যায় না, বিপ্লব সামাদ্দারদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়। দিদিমণি যেভাবে তাঁর দল চালাচ্ছেন তাতে তৃণমূলে ভাঙন অনিবার্য। ■

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনও রাজধর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না

দিব্যজোতি চৌধুরী

মানুষের ব্যক্তিসত্তা আর সামাজিক সত্তা এক না আলাদা, এনিয়ে ভালোরকম বিতর্ক রয়েছে। কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন মানুষের এই দুই সত্তা অভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য মতের মানুষরা আবার বলেন যে এটি একটি অপরটির উল্টো ধারণা এবং পরস্পর বিরোধী। কোনটা ঠিক আর কোন মত ভুল সে বিতর্কে না গিয়ে বরং একটা নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের একটা মৌলিক প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন এদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, কেননা সমাজ কিছু ব্যক্তিমানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছাড়া কিছু নয়। মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্বই নেই। মানুষের চেষ্টাতেই উন্নত সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজের উন্নতি মানেই তো জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি। মানুষের ভোগ সুখেই যদি না লাগল, তবে কিসের এত আবিষ্কার-উদ্ভাবন? তাই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই সমাজের সবকিছু, যাঁরা সমাজকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। যদিও সমাজ কতকগুলো মানুষের সমষ্টি, তবুও তা মানুষের তৈরি নয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজ এক নয়। তবে কোনোভাবেই তারা বিপরীত ধারণার নয়; তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও নেই। বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক। এই দর্শনের বিশ্বাস হলো যে সমাজ প্রকৃতিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ম্ভূ। শুধুমাত্র কিছুলোক একত্রে বসবাস করে বা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। এখানে বার বার করে বলা হয়েছে যে সমাজের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেখানে সমাজের একটা আত্মার কথাও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি জীবন্ত শরীরের মতোই তার একটা অবয়ব আছে, নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে, আর আছে নিজস্ব একটি মন। অর্থাৎ কিনা ব্যক্তি মানুষের মতো সমাজের নিজস্ব জীবনচর্যা রয়েছে।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠে যে, যাকে চোখে দেখা যায় না, কীভাবে হুবহু মানুষের মতো তারও আকৃতি-প্রকৃতি থাকা সম্ভব। কথাগুলো কিন্তু আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নয়, বরং অনুভূতি গ্রাহ্য। অলক্ষ্যে সমাজেরও একটি জীবনধারা বয়ে চলেছে যা ব্যক্তি নিরপেক্ষ। সমাজের অনুভূতিও কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ থেকে ভিন্ন। তাই মানুষের ব্যক্তি স্বীকৃতি আর সামাজিক স্বীকৃতি আলাদা হতে পারে। যেমন, ব্যক্তিজীবনে সৎ মানুষও সমাজে অসৎ বলে প্রতিপন্ন হতে পারেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব প্রশ্নেও পশ্চিমি ধ্যানধারণার সঙ্গে ভারতীয় ধ্যান ধারণায় যথেষ্ট অমিল রয়েছে। পাশ্চাত্যে একসময় রাজাকে সার্বভৌম বলে মানা হোত। পরবর্তীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবা হলো। অন্যদিকে আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব কোনোটাকেই স্বীকৃতি দিইনি। বস্তুত তার একক অস্তিত্বই নেই। যখন সে 'সামাজিক জীব', তখন সে একক অস্তিত্ব হারিয়ে বহুরূপে বিরাজমান। একই ব্যক্তিকে আমরা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় দেখি।

রাজা বা প্রশাসকের ধারণার বহু আগেই সমাজের অস্তিত্ব ছিল। নীতি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে রাজন্যপ্রথা প্রচলিত হয়। সেখানে সমাজের স্বার্থে বিচার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রজার স্বার্থে রাজার দায়বদ্ধতা ছিল অপরিসীম। প্রজাদের ভালো কাজের কৃতিত্ব যেমন তাদের প্রাপ্য ছিল, তেমনি সমাজে কুকর্ম হলে তিনি সমানভাবে দায়ী থাকতেন। এককথায় রাজার ব্যক্তিসত্তার একক অস্তিত্বকে স্বীকার না করে তা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সংপৃক্ত করা হয়েছে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে এর সমর্থন পাই— "প্রজা সুখে সুখং রাজ্ঞঃ, প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্।" সেই কারণে আমরা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রশাসক অথবা প্রতিষ্ঠান কাউকেই সমাজের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করি না।

যুগ যুগ ধরে বিদেশিরা শুধু লুঠ করতেই ভারতে আসেনি, ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতি অসীম কৌতূহলে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও ভারত ভ্রমণে এসেছেন। তাঁরা জানতে উৎসুক হয়েছেন যে ভারতভূমিতে এমন কী প্রেরণাশক্তি আছে যাতে প্রচুর সুখ-সমৃদ্ধি থেকেও রাজারা ত্যাগের কথা বলেন? সম্রাট অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ জয় করেছিলেন। তাঁর তো ভোগ বিলাসে ডুবে থাকবার কথা। তা না করে তিনি মানব সেবার কাজে ডুবে গেলেন! যুবরাজ সিদ্ধার্থ ভরা সংসারের সুখ ছেড়ে বুদ্ধদেব হয়ে মানব মুক্তির পথ খুঁজলেন। উত্তরটা সম্ভবত ভারতীয় সমাজের আত্মিক চেতনা যার কেন্দ্রস্থলে আছে ধর্ম। এ ধর্ম একটি বিশেষ মত, সম্প্রদায় বা উপাসনা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা, বিবেকবোধ ও মনুষ্যত্ব যা শুধু নিজেদেরই নয়, বিশ্বসমাজের কল্যাণ করে। এই ধর্মজ্ঞান থেকেই ভারতীয় রাজারা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েও

অপরের দেশ লুঠ করে নিজেদের সম্পদ বাড়ানোর কথা না ভেবে সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার ভেবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এইভাবে আমরা ধর্মকেই সমাজের মাথায় বসিয়েছি। সব ব্যক্তির ক্ষমতার উৎস হলো ধর্ম এবং সকলেই ধর্মপথে চলতে বাধ্য। আজও আমাদের দেশে শাসকরা দায়িত্বভার নেবার আগে ধর্মের নামে শপথ নিয়ে দেশের আইন অনুসারে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার অঙ্গীকার করেন। অসৎ কাজের ফলে প্রশাসক শুধু সমাজের সমর্থনই হারায় না, শাসনের নৈতিক অধিকারও হারিয়ে ফেলে। ইতিহাসে এমন নজিরের খুব একটা অভাব নেই। কুখ্যাত ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিদায় নিশ্চিত হয়। আইনি বা নির্বাচনী পরাজয়ের অনেক আগেই তাঁর নৈতিক পতন ঘটেছিল। আবার রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত দুর্নীতি তো প্রমাণই হয়নি। কিন্তু জনগণের চোখে অপরাধী হতে আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার মাঝামাঝি সময়ে এসে শাসকগণ সেই অধিকার হারিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনও তাঁদের রাজধর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেনি। এ রাজ্যে প্রশাসনকে রাজধর্ম থেকে দলধর্মের দাসে পরিণত করেছিলেন বামপন্থীরাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধর্মচ্যুতির উত্তরাধিকারটি অসামান্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চূড়ান্ত অধর্মে রূপান্তরিত করেছেন। তাই তিনিও শাসনের নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। এ অধিকার বিধানসভার আসনসংখ্যা বা প্রাপ্ত ভোটানুপাতের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নীতিনিষ্ঠভাবে রাজধর্ম পালনের সামাজিক অনুমোদনের উপর।

অথচ এই সত্যকে বেমালুম অস্বীকার করে তিনি বার বার আইন ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং তাঁর দলের অন্যদেরও আইন ভাঙতে উৎসাহিত করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অসীমদর্পে দেশের নিরাপত্তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি অপরাধীদের আড়াল করছেন। তাঁর চারপাশে বিভিন্ন পরিসরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগে জড়িয়ে পড়ছেন তাতে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর পক্ষে রাজধর্ম পালন সম্ভবতই নয়, কেননা প্রশাসক দুর্নীতিতে ডুবে থাকলে প্রশাসনকে তার স্বাভাবিক কাজ করতে দেওয়া যায় না।

তাই সার্বিক অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, আজ সমাজেরই প্রয়োজন এই ভারতীয় মতাদর্শটির চর্চা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ■

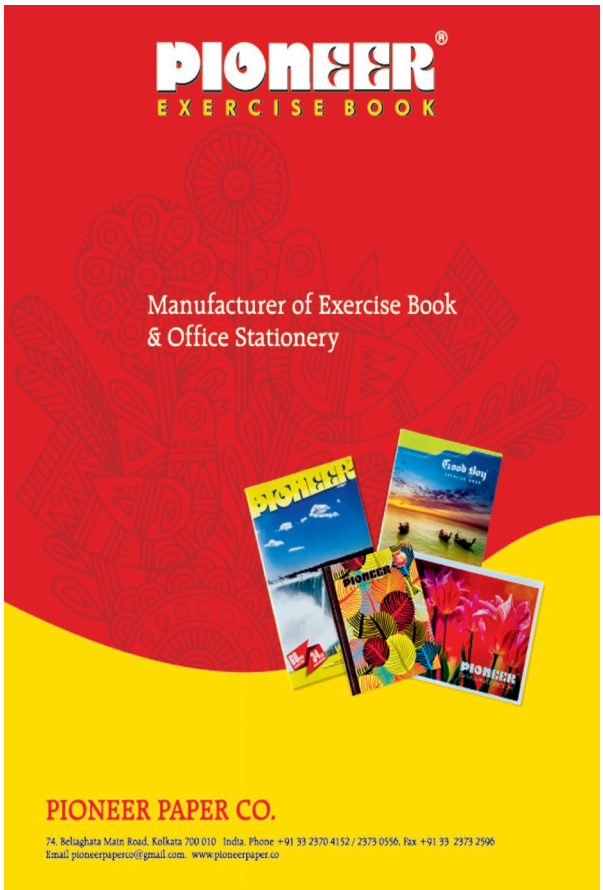

নেত্রদান মহাদান

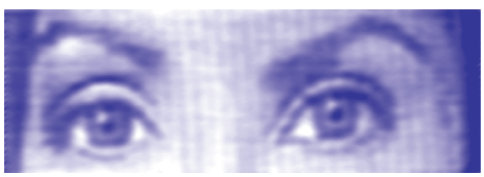

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পূর্বদিকে সফর ও সার্ক সম্মেলন

মেঃ জেঃ কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

মায়ানমার (পুরাতন বার্মা) ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই ভারত ও বার্মার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল, ভারতে বৃটিশ সরকারের চাকুরি নিয়ে বহু ভারতীয় ব্রহ্মদেশে চাকুরি করতে গিয়েছিল। আবার কাঠের ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসার জন্য ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিত। অনেক সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বার্মার কথা লিখেছেন। জাহাজে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে রেঙ্গুন যাওয়ার সময়, সেই মাঝি মাল্লার উপদেশ, ''কর্তা কাপ্তান কইছেন, ঝড় উঠতি পারে, নীচে যান'' আজও বাঙালি হৃদয়ে সমুজ্জ্বল। স্বাধীনতার পর উথান্টের আমলেও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কিন্তু মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভারত সরকার মায়ানমারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছিল। চীন এই সুযোগটা লুফে নিল। সামরিক জুনটাকে তোল্লাই দিয়ে শিল্প বাণিজ্য রাজনৈতিক স্তরে মায়ানমারে জাঁকিয়ে বসল। গণতান্ত্রিক নেত্রী আন সু কি জেলখানায় বন্দী হয়ে রইলেন। তৎকালীন ভারত সরকার 'পূর্বের দিকে তাকাও' নীতি গ্রহণ করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তেমন কিছু পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদী।

এবার মায়ানমারে 'পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন' (দশ সদস্যের আসিয়ান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগে মায়ানমার সফরও সেরে নিলেন। বহু বছর পর ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী মায়ানমার সফরে গেলেন। মায়ানমারে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাও মোদীর সঙ্গে একমত হয়ে আশা প্রকাশ করেছেন, মায়ানমার শীঘ্রই গণতন্ত্রের পথে হাঁটবে।

মায়ানমারের রাষ্ট্রপ্রধান থিয়েন মেইনের সঙ্গে আলোচনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারকে ভারতের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্ট থিয়েন ভারতকে মায়ানমারের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। ভারত মায়ানমারের উন্নয়নে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারত প্রযুক্তিগত উদ্যোগে যথেষ্ট উন্নয়ন করতে পেরেছে এবং মায়ানমারের উদ্যোগ-পতিদের ভারতে নিবেশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ভারতও মায়ানমারে ভারী শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্থলপথে যোগাযোগ বাড়াবার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড রাজপথ নির্মাণ প্রকল্প ২০১৭-তে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, তা যাতে অন্তত ২০১৮-তে সম্পূর্ণ হয়, আশা প্রকাশ করেছেন। ভারতে যাতে মায়ানমার থেকে পর্যটক বহু সংখ্যায় আসতে পারে, তার জন্য বৌদ্ধ ধর্মস্থানে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে বলে ভারত জানিয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নিঃশুল্ক পণ্যের আমদানি রপ্তানি এবং বিভিন্ন কাজের (সার্ভিস) সেক্টর নিয়ে চুক্তির পরও কোনো প্রগতি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিষয়েরও অবতারণা করেন। এই বিষয়ে উল্লেখ্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া না হলে একক ভাবে কোনো রাষ্ট্র অগ্রসর হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি থিয়েনকে জানান আগামী বছর সম্ভব হলে একক ভাবে তিনি মায়ানমার সফরে আসার প্রয়াস করবেন।

পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে আসিয়ানের সমস্ত নেতাই উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ওবামা, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী এ্যাবে প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মেলনের পর বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। সকলেই তাঁর চিন্তাধারা ও বক্তব্যের তারিফ করেছেন। এই সম্মেলনে কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমত, ভারত প্রস্তাব করে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষাগত প্রযুক্তিগত যোগ্যতার শংসাপত্র সকলেই গ্রহণ করুক। বর্তমানে ভারতের কোনো ব্যক্তি ওইসব রাষ্ট্রে চাকুরির সন্ধানে গেলে, সেই সব রাষ্ট্রের পরীক্ষায় যোগ্যতার মান প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। সেইসব রাষ্ট্র মান সম্বন্ধে

সন্তুষ্ট হওয়ার পরই কাজ করার লাইসেন্স দেওয়া হয়। অনেক রাষ্ট্রই রাজি হয়েছে, তবে ফিলিপাইন্স-সহ দু-একটি রাষ্ট্র মনে করে ঝাঁকে ঝাঁকে কর্মপ্রার্থী ওইসব রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে, সেইসব রাষ্ট্রের বেকার যুবক-যুবতীরা আরও অসুবিধায় পড়বেন। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে অপটু ব্যক্তিরা ওইসব রাষ্ট্রের কর্ম-কুশলতার মান হ্রাস করে দিতেও পারে। এ বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সেই একই ভাবে নিঃশুল্ক পণ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের অনীহা

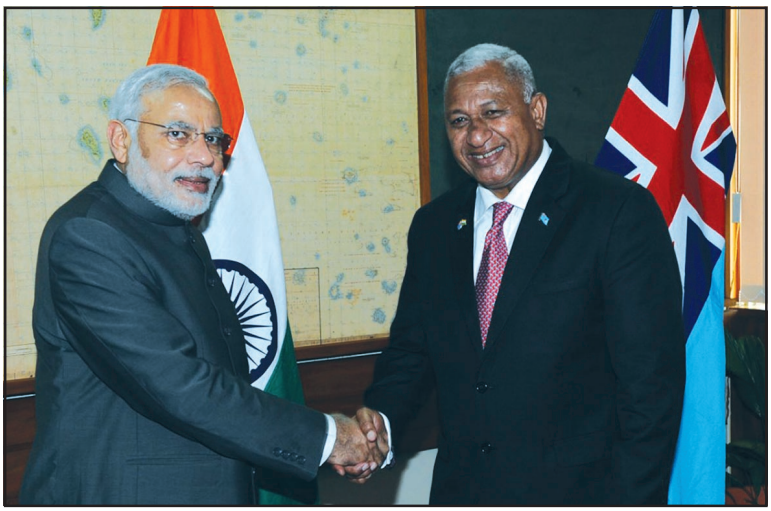

ফিজির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোদী।

না থাকলেও কর্মক্ষেত্রে (সার্ভিস সেক্টরে) তাঁদের অসুবিধা আছে। নিঃশুল্ক পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত যদিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সার্ভিস সেক্টরে ভারতের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এক্ষেত্রে আরও আলোচনা হবে। পর্যটনের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দিয়ে উৎসাহ প্রদানে সকলেই একমত। ভারত 'অনলাইন' ভিসা প্রদানের প্রস্তাব রেখেছে।

'আসিয়ান রাষ্ট্রসমিতির' নিয়ম অনুসারে সংস্থার সমস্ত রাষ্ট্র সহমত হওয়ার পর নিজ নিজ জাতীয় সংসদের সম্মতি নিতে হবে। পণ্য এবং শ্রম (সার্ভিসেস) নিঃশুল্ক চুক্তির ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা সর্বসম্মত হলে সর্বাত্মক অর্থনৈতিক অংশীদার (কমপ্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ) হিসাবে ভারত গণ্য হবে। যদিও ভারত অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করেছে, একমাত্র ফিলিপাইন্স ছাড়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েসিয়া, লাওস, ক্যামবোডিয়া, ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। শুধুমাত্র ফিলিপাইন্স ভারতের বিভিন্ন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শংসা মানতে এখনও রাজি হয়নি। ভারত অবশ্য ফিলিপাইন্সের শংসাপত্র মানতে রাজি হয়েছে। ফিলিপাইন্স রাজি হলে, ভারতের অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, তথ্য প্রযুক্তির কর্মীরা আসিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করার সুযোগ পাবেন। ভারতের পূর্ববর্তী সরকার নিঃশুল্ক পণ্যের আমদানি চুক্তি করায় সংসদে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, "এত তড়িঘড়ি চুক্তি করার কি প্রয়োজন ছিল?" ইত্যাদি। ভারত এই মহাদেশে যথেষ্ট শক্তিধর রাষ্ট্র। এই বোঝা ভারত বহন করতে সমর্থ হবে। আসিয়ানের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলার। আগামী দু-বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার প্রয়াস চলছে। যদিও আমদানি-রপ্তানি মূল্য ভারতের প্রতিকূলেই রয়েছে। আশা করা যায় --- ফিলিপাইন্সও সার্ভিস সেক্টরে ভারতের শংসাপত্র তাদের সম-মানের বলেই আগামী দিনে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তখনই ভারত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে লাভের মুখ দেখবে।

আসিয়ানে প্রধানমন্ত্রী মোদী চীনের নাম না করেই বিশ্বের সমুদ্র আইনের উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই আইন বিশ্বের সর্বত্র সমান ভাবে প্রতিটি সমুদ্রে বলবৎ করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রই কোনো সমুদ্র নিজস্ব রাজ্যসীমায় অবস্থিত বলে দাবি করে সমুদ্র তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলির সমুদ্র থেকে অর্থনৈতিক লাভ রোধ করতে পারবে না। এর ফলে চীন হয়তো ভারত-চীন নিয়ন্ত্রণ রেখায় নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। লি কেকিয়াং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করেছেন ঠিকই। কিন্তু অনেকে মনে করেছেন, সেই করমর্দনে উষ্ণতার অভাব কিছুটা লক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে চীনের প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে গিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আশা করা যায় সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে চীন-জাপান বিবাদ কিছুটা প্রশমিত হবে। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রধানমন্ত্রী ফিজি সেরে নেন। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ওই রাষ্ট্রকে ভারতের পক্ষ থকে ৭০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন। 'আসিয়ান' সম্মেলনের শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন শহরের উদ্দেশে রওনা হন। এবারে ওই শহরে জি-২০ গোষ্ঠীর শিখর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

'আসিয়ান' বৈঠকে ফলাফল কি হলো ভবিষ্যতেই পরিষ্কার হবে। বিশেষ করে উন্নয়নের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্র 'পশ্চিমকে জোড়, পুবের দিকে লক্ষ্য রাখ' কীভাবে 'আসিয়ানে গ্রহণযোগ্যতা পায় সেটাই বিবেচ্য। ১৯৯০ থেকে ভারত-পুবে তাকাও' নীতি গ্রহণ করেছে, আঞ্চলিক আলোচনার শরিক হয়েছে। ১৯৯২-এ এবং ১৯৯৬-এ পূর্ণ আলোচনার আসন পেয়েছে। ২০০২-এ শিখর আলোচনায় প্রথম আমন্ত্রণ পায়। কিন্তু তারপর যোগাযোগ তেমন ভাবে অগ্রসর হয়নি। যদিও আসিয়ানের সঙ্গে উন্নততর আদান-প্রদানের সুযোগ এবং সম্ভাবনা অফুরন্ত। আসিয়ান চাইছে সুরক্ষা বিষয়ে যোগদান এবং ভারতের আর্থিক সহায়তা।

ভারত চায় বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানব সম্পদের বিকাশ, কৃষি, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, পরিবহণ, পর্যটন, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যোগদানের সুবিধা। ব্রিসশহরে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মোদী অভ্যর্থনায় অভিভূত। উষ্ণ আলিঙ্গন করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টনি এ্যাবট প্রধানমন্ত্রীকে ভাই বলে সম্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন সম্পর্ক তুলে ধরতে অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য আইনজীবী জন লাং-এর একটি হলফনামা যা তিনি ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন, সেই 'ডকট্রীন অফ ল্যাপ্স' এবং তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে পাঠিয়ে ছিলেন, সেটি উপহার দেন। এই হলফনামায় গোয়ালিয়রের রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের পক্ষে তিনি আইনজীবী নিযুক্ত হয়ে কেন লক্ষ্মীবাঈয়ের দত্তক পুত্রকে সিংহাসনের অধিকারী নিযুক্ত হতে ইংরেজ সরকার বাধা দেবে— এর প্রতিবাদ জানিয়ে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন।

মিঃ এ্যাবট জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতি হিসাবে অভ্যর্থনা ভাষণে বিগত এক বছরে জি-২০ গোষ্ঠী কতটা সফল হয়েছে তার বিবরণ দেন। বিশ্বের গড় উৎপাদনে শতকরা ২ শতাংশ বৃদ্ধি ধরা হয়েছিল, যার আর্থিক মূল্য অন্তত তিন ট্রিলিয়ন ডলার, যার ফলে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রে বেকারদের কর্মের সুযোগ মিলবে। আলোচনা কম করে প্রত্যেক সদস্যকে নিজ নিজ রাষ্ট্রে জি-২০-র নির্ঘণ্ট রূপায়ণে বেশি প্রয়াস করতে তিনি আহ্বান জানান। আগে কখনও এমন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়নি। বিগত ছয়-সাত মাসেই লক্ষ্যমাত্রার অন্তত ৫০ শতাংশ ফললাভ হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অন্তত হাজার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ হলে বিশ্বকে আর কখনও বিশ্বব্যাপী মন্দার সম্মুখীন হতে হবে না বলেই তাঁর ধারণা। উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উত্তর পাওয়া যাবে। জীবন মানের উন্নয়নই এই সমৃদ্ধি লাভের লক্ষ্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন ব্রিসবেনের এই শিখর সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানরা বিশ্বে কর্মসংস্থান, শুল্ক সমন্বয়, পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, ভ্রষ্টাচার, আর্থিক ব্যবস্থার নবীকরণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে আগামী বছরের জন্য দিগ্‌দর্শন করতে সমর্থ হবেন। অনেকে মনে করেন, এই জি-২০ শিখর সম্মেলন তেমন কোনো পথ প্রদর্শনে অসমর্থ থেকে গেছে। কারণ রাশিয়া— ইউক্রেন সমস্যা, ইরাক-সিরিয়া-খিলাফত সমস্যা সম্মেলনে ছায়া ফেলেছিল।

ফিলিপাইন্সের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোদী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কালোটাকা উদ্ধারে সমস্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রশ্ন তোলেন। সমালোচনার মুখে পড়ে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পুটিন সম্মেলন থেকে চলে যান শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে। কারণ ব্রিটেন-সহ কয়েকটি রাষ্ট্র পূর্ব ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা পাঠানোর জন্য রাশিয়ার সমালোচনা করেছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্র আগামী দিনে কতটা উন্নয়নে আশাবাদী, এই প্রশ্নে ভারত জানায় ৫.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫.৯ শতাংশে জাতীয় গড় উন্নয়ন হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র শ্রম আইন সংশোধনে ব্রতী হয়েছে। ফলে শিল্পসংস্থাগুলির পক্ষে কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে সুবিধা পাবে। ভারতও এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রশ্ন ছিল, খাদ্য ও কৃষিতে ভরতুকি বন্ধের বিষয়ে কতটা অগ্রসর হওয়া গেছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার পর স্থির করেছে ভারতের চরম দরিদ্র মানুষের স্বার্থে খাদ্যে ভরতুকি বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলি কীভাবে ভারতকে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা চলছে।

বিশ্ব অর্থ তহবিল (আই এম এফ) লগ্নিকারী সংস্থার তহবিল বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাহায্য দিতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের গড় উৎপাদন আরও ২ শতাংশ বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়ে এই সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্স ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা সেরে নেন। এর আগে 'ব্রিক', ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং চীনের সংগঠন (বি আর আই সি) আলোচনায় বসেছিল। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য 'নতুন উন্নয়ন ব্যাঙ্ক' (এন ডি বি)-র গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার এবং অর্থ সাহায্যের তহবিলও হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার। ভারত সকলের সঙ্গে সম পরিমাণ অর্থ তহবিল গঠনের জন্য দিতে রাজি হয়েছে। চারটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের জন্য একটা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা হয়। আগামী বছর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে বলে 'ব্রিক' আশাবাদী। পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়েও আলোচনা হয়। চীন এবং রাশিয়া বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। উন্নত দেশগুলি যত পরিমাণ কার্বনগ্যাস ছাড়ে, ভারত সেই অনুপাতে অনেক কম গ্যাস ছাড়ে। কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে কয়লা ছাড়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুযোগ ভারতে অনেক কম। সেইজন্য ভারত উন্নত রাষ্ট্রগুলির কাছে সাহায্য চেয়ে বিকল্প প্রস্তাব চেয়েছে। তার উপরই নির্ভর করবে ভারতের

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোদী।

প্রয়াস। এতদিন ভারত ও চীন একদিকেই ছিল। অনেকেই মনে করেন, চীনের সঙ্গে সহমতের প্রস্তাব এখন আর তেমন কার্যকর হবে না। জি-২০ শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারেন। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ যে ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে একতাবদ্ধ হয়ে এই শত্রুর মোকাবিলার উপর জোর দেন। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক এবং শিল্প উদ্যোগে ব্রতী হতে হবে এবং একে অপরকে সাম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিতে হবে এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে জি-২০ শিখর সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

নরেন্দ্র মোদী দেশে ফিরেই কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। এবছর 'সার্ক' রাষ্ট্রগুলির শিখর সম্মেলন কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরে দক্ষিণ এশিয়ার 'অঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে অপরিহার্য'— এটাই শিখর সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

প্রধানমন্ত্রী কাঠমাণ্ডু পৌঁছে প্রথম ভাষণেই জানিয়েছেন শপথ গ্রহণের দিন থেকেই তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় বন্ধুত্বের বাতাবরণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং সাউথ এশিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশনস (সার্ক) গোষ্ঠীর প্রতিটি রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে আলোচনাও করেছেন।

এই শিখর সম্মেলনে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি পরিবেশটাকে যথেষ্ট ভারাক্রান্ত করেছিল। বিশেষ করে যুদ্ধ বিরতি রেখায় পাকিস্তানের গোলাগুলি বর্ষণ এবং ভারতের পাল্টা জবাব সম্পর্কে এমনই তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল যে নওয়াজ শরিফ ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময় সেই শেষ দিনে সামান্য করমর্দনের মধ্যেই সীমিত ছিল। করমর্দনে উষ্ণতা ছিল অনুপস্থিত।

নেপাল সরকারের সঙ্গে ভারত দশটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। দিল্লী-কাঠমাণ্ডু বাস পরিষেবা আরম্ভ হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটা 'সার্ক' উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রস্তাব দিয়েছেন, এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় 'সার্ক' রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির যোগাযোগ নিবিড় হবে। সেই একই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শুধুমাত্র রেল যোগাযোগই নয় রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ছাড়া ব্যক্তিগত পরিবহণও যদি চলাচল করতে পারে পর্যটন শিল্প বিশেষ ভাবে উন্নীত হবে।

চীন 'সার্ক' গোষ্ঠীতে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা থেকে আঞ্চলিক সদস্যপদ পেতে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তারা নেপালের কয়েকজন মন্ত্রীকে সার্ক সম্মেলনে এই বিষয়ে সুপারিশ করতে প্রস্তুত করেছে। পাকিস্তানও জানিয়েছে, বিগত ৩০ বছরে 'সার্ক' গোষ্ঠী তেমন কোনো উন্নতির মুখ দেখেনি। সময় এসেছে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রগুলিকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দেওয়ার। শোনা যায় চীন আগামী পাঁচ বছর, প্রতি বছর ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দক্ষিণ এশিয়ায় পরিকাঠামো উন্নয়নে 'সার্ক' তহবিলে দিতে আগ্রহী। ভারত মনে করে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থান করে না। 'সার্ক' গোষ্ঠী শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক সংগঠন। এ বিষয়ে আগামী দিনে হয়তো আরও আলোচনা হবে। কারণ চীন পাকিস্তানের সর্বকালের সুহৃদ, বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সুরক্ষা চুক্তি রয়েছে, শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরের উন্নয়নে চীন অর্থ ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে। আফগানিস্তানে তারা বাণিজ্য ও উন্নয়নের প্রস্তাব নিয়ে প্রবেশ করেছে। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, পাকিস্তান-ভারত শিখর সম্মেলন কি 'সার্ক'-এর সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হতে পারে? সরতাজ আজিজ জানিয়েছেন, ভারত চাইলেই হতে পারে, ভারতই সচিব পর্যায়ের আলোচনা রদ করে দিয়েছিল। পাকিস্তান আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আলোচনা চাইবে না। ভারতের সচিব আকবরউদ্দিন জানিয়েছেন সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। পাকিস্তানকে সন্ত্রাস ত্যাগ করতে হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে আলোচনা চালানো যাবে না।

বিদায়বেলায় নওয়াজ শরিফ ও নরেন্দ্র মোদী করমর্দন করে সৌজন্য বজায় রেখেছেন। এর পরের 'সার্ক' সম্মেলন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাঠমাণ্ডু সার্ক সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

পাক-দৌরাত্ম্য রুখে সার্ক-দৌত্য ভারতের

সারথি মিত্র

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ বৈঠকে পাক-সন্ত্রাস প্রশ্নে অনমনীয় মনোভাব নিল ভারত। গত ২৬ নভেম্বর এই বৈঠকে দু'বছর আগের মুম্বই হামলার (২৬/১১) কথা স্মরণ করিয়ে দেন মোদী। বিশ্বব্যাপী এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশকে একসঙ্গে লড়ার বার্তাও দেন তিনি। বলাই বাহুল্য বাকি দেশগুলি মোদীর এই আহ্বানে সাড়া দিলেও পাকিস্তান দেয়নি। আসলে পাকিস্তান চাইছিল চীনকে সার্ক-গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সদস্য করে নিতে। যাতে একযোগে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো যায়। কিন্তু এদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম যেখানে নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদী সেখানে পাক- পরিকল্পনা যে সহজে খাটবে না, সেটা নওয়াজ শরিফ খানিকটা দেরিতে বুঝলেন। কিছু দিন আগে মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যে অতিথি- বৎসল শরিফকে দেখেছিল দুনিয়া, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তার ছিটেফোঁটাও নেই। কূটনীতিকরা মনে করছেন এর পেছনে পাক-গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এবং পাক-সেনাবাহিনীর মদত ও প্রভাব রয়েছে। ভারতকে বিপাকে ফেলতে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পাকিস্তান সক্রিয়। একাধিকবার তারা অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। প্রায় তিন বছর বাদে কাঠমাণ্ডুতে শীর্ষ বৈঠক আয়োজিত হচ্ছে। এত দেরি হবার মুখ্য কারণ ছিল নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া। এবছরের আগস্টে যখন সার্ক শীর্ষ বৈঠকের সূচি চূড়ান্ত হলো, তার কিছুদিন আগেই ভারত-পাক বৈঠকের সম্ভাবনা স্থগিত হয়ে যায়। তার ছায়া যে এই সার্ক বৈঠকে পড়বে তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে শক্ত হাতে এবং অনমনীয় মনোভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। এবারের বৈঠকে মোটামুটি তিনটি বিষয় আলোচনার জন্য ছিল। প্রথমত, সার্ক মোটর ভেহিকল চুক্তি— যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য; দ্বিতীয়ত, সার্ক আঞ্চলিক রেলওয়ে চুক্তি; তৃতীয়ত, শক্তি সহযোগিতা (বিদ্যুৎ)-র ব্যাপারে সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি। পৃথিবীর সব মিডিয়াই জেনে গিয়েছে যে পাকিস্তান হলো একমাত্র সার্কভুক্ত দেশ, যারা ভূতল পরিবহণ এবং সংযোগ-চুক্তির বিষয়ে আপত্তি তুলেছে। পাকিস্তানের যুক্তি, তাদের 'অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া' এহেন চুক্তির জন্য প্রস্তুত নয়। আসল কারণটা কিন্তু অন্য। পাকিস্তান আতঙ্কিত, কারণ এই চুক্তি হলে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দিয়েই আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। বস্তুত পাকিস্তানের জন্যই গত ২৬ নভেম্বর আলোচ্য বিষয়গুলি একপ্রকার ভেস্তে যায়। অথচ, নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র 'পাশে পাশে নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকার' বার্তা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, 'উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমি সমগ্র অঞ্চলটিকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' সার্কভুক্ত দেশগুলিকে দিশা দেখাবার প্রাথমিক কাজটাও শুরু করেছিলেন তিনি। যেমন প্রত্যেকটি সার্ক-সদস্য দেশকে নিয়ে (পাকিস্তান সমেত) অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। ঘোষণা করেছিলেন, আগামী ২০১৬-র মধ্যে ভারত সার্ক স্যাটেলাইট স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে। গোটা সার্ক অঞ্চলেই পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি।

নেপালে প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সার্ককে শক্তিশালী করতে ভারতের এইসব প্রস্তাব ও প্রয়াস একমাত্র পাকিস্তান বাদে আর সবক'টি সদস্য দেশ সমর্থন করে। ১৮তম এই সার্ক-বৈঠককে ভেস্তে দিতে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নজিরবিহীন উদ্যোগ দেখা যায়। পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ প্রথমেই আয়োজক দেশ নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালাকে 'ম্যানেজ'

করতে চেষ্টা করেন যাতে চীনকে সার্কের সদস্যপদ দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মোদীর কৃতিত্ব হলো চাপের মুখেও তিনি কোনো অনমনীয় মনোভাব দেখাননি। পাকিস্তান বাদে প্রত্যেকটি সার্ক-সদস্যের সঙ্গে মোদী আলাদাভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। পাকিস্তান আগাগোড়াই ভেবে আসছিল চাপ দিয়ে ভারতকে বোধহয় নরম করা যাবে। কিন্তু উল্টো ফল হচ্ছে বুঝে তারা নিজেরাই চাপে পড়ে যায়। ২৬ নভেম্বর তাই যারা সার্কের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও উপযোগী তিনটি চুক্তি বাতিল করে দিচ্ছিল তারাই ঠিক তার দু'দিন বাদে ঢোক গিলে শক্তি-সহযোগিতা চুক্তিতে সই করতে রাজি হয়ে যায়। এবং বাকি দু'টি চুক্তিতেও সম্মতি জানাবার জন্য তিনমাস সময় চেয়ে নেয়।

পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ছিল চীনকে যেনতেন প্রকারেণ সার্কের সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়া। গত ২৫ নভেম্বর চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী লিউ ঝেনমিন মন্তব্য করেন যে, তাঁর দেশ সার্কে আরো বড়ো ভূমিকা পালন করতে চায়। স্বভাবতই এহেন বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল সার্কের সদস্যপদ পাওয়াই আসলে চীনের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত ২০০৬ সাল থেকে সার্ক সম্মেলনগুলিতে 'পর্যবেক্ষকে'র পদ গ্রহণ করেছে চীন। এই তালিকায় আরো রয়েছে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশ। সব মিলিয়ে এই নিয়ে ১৪টি সার্ক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করল চীন। সম্মেলনের কিছু আগেই কয়েকজন নেপালি রাজনীতিককে দিয়ে সার্কে চীনের সদস্যপদের দাবি তোলায় পাকিস্তান। কৌশল এক্ষেত্রে পরিষ্কার— চীন, পাকিস্তান একযোগে ভারতকে কূটনৈতিক চাপে ফেলবে। নেপালের ওপর থেকে ভারতের প্রভাব বা আধিপত্য কমিয়ে (নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে সফর করেন নেপালে তাতে দু'দেশের কূটনৈতিক মেলবন্ধনও এই মুহূর্তে অসাধারণ) চীন-পাকিস্তান প্রভাব বিস্তার করে একদিকে অশান্ত করবে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আর সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে কাজে লাগাবে নেপালকে।

চীন-পাকিস্তানের এই অপকৌশল পড়ে ফেলতে দেরি করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে নেপালকে উপঢৌকন দিয়ে সেদেশের মানুষ ও প্রশাসনের মন জয় করতে চেয়েছেন তিনি। যেমন— ভারতীয় সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকসে'র প্রস্তুত করা আধুনিক লাইট সামরিক হেলিকপ্টার 'ধ্রুব মার্ক থ্রি' নেপাল সরকারকে উপহার দেন মোদী। এর বাজার মূল্যও নেহাত কম নয়, অন্তত ৬০-৮০ কোটি টাকা। অন্যদিকে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে নতুন চুক্তির পথেও এগিয়েছেন মোদী। যেমন— আগামী তিন মাসের মধ্যে মোটরগাড়ি শিল্প এবং হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি নিয়ে ভারত-নেপালের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি কাঠমাণ্ডু-নয়াদিল্লী বাস চলাচলের সূচনা করে দু'দেশের মানুষের সংযোগের ব্যাপারেও যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারেরও উদ্বোধন করেন তিনি। একদশকের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেপাল ও ভারতের নাগরিকরা একে অন্যের দেশে গেলে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট (২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত) নিয়ে যেতে পারবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি। এতদিন শুধু ১০০ টাকার নোট নিয়ে যাওয়া যেত। সেদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে নেপালের সংবিধান তৈরির কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করার অনুরোধ করেছেন মোদী। বলছেন— 'না হলে নেপালের দুঃখের সময় সাহায্যের হাত-বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারত অসুবিধের মুখে পড়তে পারে।' সবমিলিয়ে নেপালকে ভারত বার্তা দিতে চেয়েছে নেপালের প্রকৃত মিত্র তারাই। চীন পাকিস্তানের পাতা ফাঁদে যেন পা না দেয় তারা।

নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশকেও ইতিবাচক বার্তা দিলেন তিনি। তিস্তা ও স্থলসীমা চুক্তি যে অতি দ্রুত রূপায়িত করবে ভারত সেকথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনাকে জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন মোদী। গত ২৫ নভেম্বর এনিয়ে প্রবল বিরোধী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সম্মতি নিয়েই বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে স্থলসীমা চুক্তি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়াটি। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসের আগে সংসদে ছিটমহল সংক্রান্ত বিলটি পাশ করে ঢাকাকে বিজয়দিবসের উপহার দিতে চাইছে দিল্লী। এই মুহূর্তে ঢাকা-দিল্লী কূটনৈতিক যোগাযোগ যে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় সন্ত্রাস ঠেকাতে, সর্বোপরি ভারতের নিরাপত্তার জন্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত-বাংলাদেশের এই দৌত্য যে পাকিস্তান ও চীনের কপালে ভাঁজ ফেলবে তা বলাই বাহুল্য।

সব মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর কৌশলী কূটনৈতিক চালে সার্কে একঘরে হয়ে পড়ল পাকিস্তান। একদিকে 'পুবে তাকাও' নীতি নিয়ে ভারত নেপাল, ভুটান, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন প্রতিবেশীর সম্পর্ককে আরো উন্নত করতে চেয়েছে, অন্যদিকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে দেয়নি। শুধু কূটনৈতিকই নয়, বাণিজ্যিক ও সামাজিক যোগাযোগ বাড়াতেও ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আর এতেই দমেছে পাকিস্তান ও তার দোসর চীন। পরে মোদীর হাতে হাত মেলাতে বাধ্য হলেও কিংবা চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর করতে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেও পাক-অস্বস্তি গোপন থাকেনি। আর সেই অস্বস্তি যে ভারত-বিরোধী অপকৌশল ব্যর্থ হওয়ার জ্বালা সেটা বুঝতেও আমাদের দেরি হয় না। ■

ভীতু বাংলার পুলিশ

পুলিশ তুমি কার? আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ কি তুমি নও? সারারাজ্যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত সংখ্যালঘু মৌলবাদী সংগঠনগুলি ধর্মীয় মৌলবাদের পাশাপাশি দেশে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া, অস্ত্র মজুত করে দেশে থেকে দেশদ্রোহিতার ছক কষে যাচ্ছে। স্কটল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয় রাজ্যপুলিশের হাল যেরূপ তলানিতে পৌঁছেছে তাতে করে এই ক্রমাবনতিতে পৌঁছনো পুলিশের সঙ্গে স্কটল্যান্ড নয় নাগাল্যান্ডের পুলিশের সঙ্গেও তুলনা করলে নাগাল্যান্ডের পুলিশ অপমানিত বোধ করবে। হয়তো বলে বসবে 'সারমেয় সদৃশ পুলিশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করার জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি'।

রাজ্য পুলিশ নিজ নিজ পদমর্যাদা ভুলে সারমেয়র ন্যায় লাঙ্গুল নেড়ে চলেছে শুধু শাসক শ্রেণীর পক্ষেই নয়, শাসকশ্রেণীর দুর্বৃত্তদের নিকটও। এই রাজ্যের পুলিশ দোলা ব্যানার্জির হাতে চড় খায়, আকাশ ব্যানার্জির হাতে মেরে খায়, সঞ্জয় দাসের হাতে চড় শুধু নয় মাটিতে ফেলে মারে, গাড়ি ভেঙে দেয়। তবুও পুলিশ কিছুই করে না। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ম্যাডামের ভয়ে প্রথমে কোনো কেস করেননি পরে চাপে পড়ে মামুলি কেস করে। যেটা পরে ধামাচাপা পড়ে যাবে। ভাঙ্গড়ের দু'পক্ষকে শায়েস্তা করতে পারে না। তাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে তাদের সামনে রেখে পিছু পিছু গিয়ে অবস্থা সামাল দেয়।

বর্তমানের পুলিশ দুর্বলের ওপর পীড়ন করে শাসকশ্রেণীকে তোষণ করে। না করলে সকলেরই অবস্থা হবে দময়ন্তী সেনের মতো। শাসকশ্রেণীর যে কোনো দুর্বৃত্ত-ক্যাডারকে ধরলে বা শাস্তি দিলে পদাবনতি ঘটবে। কঠিন কঠিন জায়গায় বদলি হবে। রঞ্জিত পচনন্দার কি অবস্থা ঘটল সকল জনগণ ওয়াকিবহাল। পুলিশ ইউনিফর্ম পরে থাকলে কি হবে পাড়া মহল্লা ও রাজ্যশাসন করে অনুব্রত মণ্ডল, আরাবুল, জাহাঙ্গির কাইজারদের মতো ম্যাডামের ভাইয়েরা।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

চিঠিপত্র

দিদির পুলিশ

আমার না আপনাদের জন্যে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। একদিন আপনাদের কী দাপট ছিল। কী মার মারতেন— লোকে বলত পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশো বারো। আর আজ আপনারা কী মার খাচ্ছেন— থানায় টেবিলের তলায় ঢুকে নিস্তার পাচ্ছেন না— ফাইল দিয়ে মাথা ঢাকতে হচ্ছে। কিল চড় লাথি ঘুষি এমনকী ইট, রড দিয়ে আপনাদের মারছে। একজনকে তো গুলি করেই মেরে দিল। আর এখন— আপনারা দিদির পুলিশেরা দেখি শীতলখুচি আপনাদের মারছে, শিলিগুড়ির ভক্তিনগরে জীপ থেকে টেনে বের করে আপনাদের বেধড়ক পেটাচ্ছে। বহরমপুরে স্কুলে গোলমাল মেটাতে গিয়ে ইঁটের ঘায়ে আপনারা জখম হচ্ছেন। পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে মহিলা কনস্টেবল আহত হচ্ছেন।

তাই বলি, কাগজগুলো যতই লিখুক কাজ নেই আপনাদের এসবে। সৈকত আপনাদের চড় মারলে অন্য গাল পেতে দিন। কারণ রাজকুমার ওকে নিয়ে মিটিং করছে। মনিরুল যতই বলুক তিনজনকে পায়ে পিষে মেরেছি, অনুব্রত যতই পুলিশকে বোমা মারতে বলুক, মহারানীর হাত যখন ওদের মাথার উপর তখন ওদের পায়ের তলায় মাথা রেখে সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, দু' পয়সা বেশি আয় করুন। তা না কোথাকার কোন হোটেলওয়ালি বলেছে আমাকে রেপ করতে গিয়েছিল আর তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ বর্মনকে ধরতে গিয়েছেন। জানেন না প্রকাশ বর্মনের দাদা উত্তম বর্মন পঞ্চায়েতের তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি। শাসক-পার্টি করে এইটুকু সুবিধা পাবেন না? এ আপনাদের অন্যায়, বিরাট অন্যায়। যেমন কর্ম করেছেন তেমন ফলও পেয়েছেন।

এন আর এস হাসপাতালের ছাত্র সংসদ শাসকদলের দখলে। ওরা কোরপানকে মারে মারুক, ওদিকে আপনারা ফিরেও তাকাবেন না। আর আপনাদের ওই পোশাকটা হচ্ছে যত গণ্ডগোলের মূল! ওটা খুলে তৃণমূলের দেওয়া গেঞ্জি পরে নিন। যদি একান্ত নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা থাকে ওই গেঞ্জির উপরই কঃ পুঃ লিখে নিন। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাপস পাল পার্টির ছেলেদের দিয়ে মা বোনদের রেপ করাতে চাইছে, করাক না। ওখানে আপনাদের মা বোন থাকলেও চুপ করে থাকবেন। টুঁ শব্দটি করবেন না। কাজ নেই আপনাদের জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার। আগে নিজেদের নিরাপত্তা তো সুনিশ্চিত করুন।

—কিশোর বিশ্বাস,
হৃদয়পুর, কলকাতা-৭০০১২৭।

সততার প্রতীক?

আমাদের সেই পুরনো বাতিক
এখনও দিদি সততার প্রতীক।
দিদি এখন বড়জোর—
আসিফ বলে ডাকাতরানী,
কুণাল বলে মহাচোর।

—দীপক সাহা,
ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

কোয়েনার্ড এলাস্টের চোখে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টদের হিন্দু-বিদ্বেষ

কল্যাণভঞ্জ চৌধুরী

কোয়েনার্ড এলাস্ট বেলজিয়ান ভারততত্ত্ববিদ। হিন্দুত্ব বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৯৯ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ সমর্থন করেছেন। তাঁর সমস্ত গ্রন্থে তিনি হিন্দুত্ব বিরোধী মুসলমান তথা হিন্দু রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এসব কারণে হিন্দুত্ববিরোধী বুদ্ধিজীবীদের তিনি বিরাগভাজন। ভুয়ো সেকুলারবাদীদের আক্রমণ সত্ত্বেও হিন্দুত্বের সমর্থনে কলম ধরে চলেছেন।

হিন্দুবিরোধী মানসিকতাকে 'নেগেসনইজম' বা 'অস্বীকারবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুত্ববাদীদের আত্মরক্ষার যাবতীয় উদ্যোগকে ভুয়ো সেকুলারিস্টরা তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করেন এবং 'অস্বীকার' করেন। এঁদের মতে মুসলমানদের সব কাজ সেকুলার এবং হিন্দুত্ববাদীদের সব কাজ সাম্প্রদায়িক।

কেন ভুয়ো সেকুলারিস্টরা এই সত্যকে অস্বীকার করেছেন? তার কারণ--- সেক্যুলারিস্টরা 'অস্বীকারবাদী' অর্থাৎ হিন্দুদের উপর মুসলমানদের সবরকম অপকর্মকে 'অস্বীকার' করেন।

তাঁর মতে, সাম্প্রতিককালে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ 'অস্বীকারবাদ'কে সমর্থন করেছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মুসলমানদের খুশি করার লক্ষ্যে খিলাফত আন্দোলন করেছিলেন যা মুসলমানদের হিন্দুবিরোধিতাকে ভীষণভাবে উৎসাহ দিয়েছিল। তাদের আলাদা 'জাতি' হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছিল। কংগ্রেসীদের এতই অন্ধ মুসলমানপ্রীতি ছিল যে ১৯৩১ সালে কানপুর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে দল সিদ্ধান্ত নেয় যে পাঠ্যপুস্তক থেকে মুসলমানদের সমস্ত হিন্দুবিদ্বেষী কাজ বাদ দিতে হবে।

কোয়েনার্ডের মতে গান্ধীর পর যে কংগ্রেস নেতা হিন্দুদের প্রতি সবচেয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করেছিলেন তিনি জওহরলাল নেহরু। মুসলমানদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। মুসলমানদের হিন্দুমন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনাকে তিনি 'অস্বীকার' করেছেন। সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির-সহ অজস্র হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছিল। নেহরুর মতে মামুদ শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তিনি মোটেই উগ্র ও ধর্মান্ধ ছিলেন না। অথচ মামুদের জীবনীকার উলবি লিখেছেন মামুদ ধর্মান্ধ ছিলেন ও কোরানের আদর্শ মেনেই মন্দির ধ্বংস করে নিজেকে সাচ্চা মুসলমান প্রতিপন্ন করেছিলেন। "স্বাধীনতার পর নেহরুর সঙ্গেই 'অস্বীকারবাদ' কংগ্রেসের মূল নীতি হয়।"

কোয়েনার্ড দেখিয়েছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উগ্র মৌলবাদী ছিলেন। ভারত বিভাজন মানতে চাননি বলে তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলে গণ্য করা হয়। অথচ তিনি তা ছিলেন না। ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন তার মূলে ছিল মুসলমানদের অখণ্ড রাখা। অপেক্ষা করেছিলেন ভারত ভাগ হলে মুসলমানরা ভারতে আরো সংখ্যালঘু হবে এবং তাদের কোমর চিরকালের মতো ভেঙে যাবে। হজরত মহম্মদ যেমন ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধি করে পরে তাদের আক্রমণ করে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন তেমনি আজাদ হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বললেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠা।

স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রথম থেকে হিন্দু মুসলমান পার্থক্য ঘটিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ভারতের ইতিহাস বিকৃত করার অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন মহম্মদ হাবিব ১৯২০ সাল নাগাদ যে ইতিহাস রচনার সূচনা করেন মূল কথা হলো তুর্কি ও মোগল শাসকরা কখনোই হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেনি। মুসলমান ঐতিহাসিকরা মামুদ, বাবর প্রমুখ শাসকের হিন্দুমন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের উপর অত্যাচার ইত্যাদির যে কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা তাঁর মতে অতিরঞ্জন। তুর্কি ও মোগল শাসকেরা ধর্মান্ধ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে।

আলিগড় ঐতিহাসিকদের 'অস্বীকারতত্ত্ব' অনুসরণ করেছেন বামপন্থী ঐতিহাসিকরা। কোয়েনার্ড লিখেছেন, মুসলমান মৌলবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোনো পার্থক্য নেই। ভারত বিভাজনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগের পাশে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতার পর এরা নেহরুর সমস্ত হিন্দুত্ব-বিরোধী নীতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। নেহরুর আমলে মার্কসবাদীরা শিক্ষাক্ষেত্র ও গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে কুক্ষিগত করেছিলেন। এবং এঁদের মুখপাত্র ঐতিহাসিকরা দরাজ সরকারি সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন : (১) মুসলমান শাসকদের হিন্দুদের উপর নির্যাতন অতিরঞ্জন, (২) সেইসময় হিন্দু-মুসলমান এইরকম আইডেনটিটি তৈরি হয়নি। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান এই পার্থক্য করে অত্যাচার করেননি। তাঁরা রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে যেটুকু বলপ্রয়োগ করা দরকার তাই করেছেন। এই মার্কসবাদী 'অস্বীকারবাদী' ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য মহম্মদ হাবিবের পুত্র ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, এস গোপাল, কে এন পানিক্কর, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, বিপান চন্দ্র, আর এস শর্মা প্রমুখ। মধ্যযুগের যে সব মুসলমান ঐতিহাসিক তুর্কি তথা মোগল শাসকদের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনি তাঁদের ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন, এঁরা সেগুলি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। হিন্দু হত্যা বা ধর্মান্তরকরণ এই সব আরোপ মিথ্যা। এই ঐতিহাসিকদের মক্কা জওরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি হিন্দুসংগঠনের সক্রিয়তা এই 'অস্বীকারবাদী'দের ক্ষিপ্ত করেছে। ■

ঋষি জৈমিনির তপস্যাস্থল

চক্রতীর্থ নৈমিষারণ্য

তরুণ কুমার পণ্ডিত

কথিত আছে, ভগবান ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে মহাতীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—

সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে ত্রেতায়াং চ পুষ্করে।
দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রে কলৌ গঙ্গা প্রবর্ততে।।

সত্যযুগে এই মহাতীর্থে মুনিঋষিরা সমবেত হয়ে ধর্মের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হাজার হাজার ঋষি জগতের কল্যাণের জন্য সাধনায় বিভোর থাকতেন। গৃহীমানুষেরা ছুটে আসতেন এখানে। তাদের বিশ্বাস এখানে এলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত পাপ স্খালন হয়ে যায়।

উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহর থেকে ৯৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মহাতীর্থ। মহাভারতে নৈমিষারণ্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র রূপে অভিহিত করে বর্ণনা করা হয়েছে —

'পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্বাণি নৈমিষে।'

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের পুণ্যফল শুধুমাত্র নৈমিষারণ্যে এলেই লাভ করা যায়।

গোস্বামী তুলসী দাস তাঁর রামচরিতমানসে নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এভাবে—

'তীরথ বর নৈমিষ বিখাতা।
অতি পুনিত সাধক সিধিদাতা।।'

গাছপালা ঘেরা বনভূমিতে অবস্থিত নৈমিষারণ্য। এই বনভূমির বুক চিরে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দর্শনীয় স্থান পর্যন্ত। শান্ত নির্জন পরিবেশ। অসংখ্য রকমের গাছে ভরে রয়েছে এই নৈমিষারণ্য। মহাভারতের কথা— একবার নারায়ণকে প্রজাপতি মনু বললেন— কলিযুগ আসছে, সেই সময় নানা অত্যাচারে লিপ্ত হবে মানুষ। তখন মুনি ঋষিরা তপস্য করবে কোথায়? নারায়ণ বিষয়টা ভেবে হাতের সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিয়ে বললেন, এই চক্র পৃথিবী ঘুরে কোনো স্থান স্পর্শ করে নিমেষের মধ্যে আমারই হাতে ফিরে আসবে। যেখানে গিয়ে এই চক্র স্পর্শ করবে, সেই স্থানটি হবে মুনি-ঋষিদের অনুকূল তপোভূমি। প্রজাপতি মনু মুহূর্তেই দেখতে পেলেন, নৈমিষারণ্যের মাটি স্পর্শ করে সুদর্শন চক্র ফিরে এলো নারায়ণের হাতে। যে স্থানটি স্পর্শ করেছিল চক্র, প্রাচীনকাল থেকে আজও তার প্রসিদ্ধি 'চক্রতীর্থ' নামে। দেবী ভাগবতে এভাবেই এই তীর্থের মহিমা বর্ণিত হয়েছে—

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থ চ পুষ্করম্।
অন্যেষাং চৈব তীর্থানাং সংখ্যানাস্তি মহীতলে।।

এখানে রয়েছে একটি সুন্দর বাঁধানো কুণ্ড। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কুণ্ডটি পরিক্রমা করে। এই কুণ্ডের পাড়েই স্থাপিত রয়েছে পরপর ভূতনাথ, ললিতাদেবী এবং ব্রহ্মার মন্দির। কথিত আছে, এই বিশাল অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ললিতা। মন্দিরে দশভুজা মূর্তি। দেবী দুর্গাই এখানে ললিতা। একটু দূরেই রয়েছে 'ব্যাসগদ্দি'। এই জায়গাটি আরও নির্জন ও শান্ত। বিচিত্র দৃশ্য। অপূর্ব এই অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষ! নৈমিষারণ্যে না গেলে তার মনোরম প্রকৃতির স্বাদ অনুভব করা যাবে না। জানা যায়, এই ছোট্ট মন্দিরেই মহাভারত যুগের ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামী বিভিন্ন শাস্ত্রের কূট প্রশ্নের মীমাংসা, ভাগবতপাঠ ও তার ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন মৃত্যুর প্রাক্কালে রাজা পরীক্ষিতকে। প্রাজ্ঞ ঋষি ব্যাসদেবও

দধীচি কুণ্ড

কিছুকাল বসবাস করেছিলেন নৈমিষারণ্যের এই ক্ষেত্রটিতে। তাই এর নাম হয়েছে ব্যাসগদ্দি। ব্যাসদেব এখানে চারটি বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন শিষ্য সুমন্ত্র, পৈল, জৈমিনী ও বৈশম্পায়নকে। লোমহর্ষম মুনিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন পুরাণ ও ইতিহাস। শাস্ত্রে এভাবে তার উল্লেখ রয়েছে—

একদা নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ মুনয়ঃ সর্বে সূতম্ পৌরাণিকং খলুঃ।।

সেখানেই রয়েছে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। কথিত আছে, এই বটগাছের নিচে ঋষি জৈমিনী তপস্যা করেছিলেন। পাশেই রয়েছে যজ্ঞকুণ্ড। ব্যাসগদ্দি মন্দিরে রয়েছে ব্যাসদেবের মূর্তি। তার পাশে সত্যনারায়ণ এবং পঞ্চপাণ্ডবের দুটি মন্দির। শোনা যায়, অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন নৈমিষারণ্যে। তাঁরা সবাই কিছুকাল আত্মগোপন করেছিলেন অদূরে অবস্থিত একটি গুহাতে। তাই সেই গুহার নাম হয়েছে পাণ্ডব গুহা। মহামতি ব্যাসদেব সিদ্ধ তপোভূমি বলে বর্ণনা করেছিলেন এই নৈমিষারণ্যকে। অষ্টআশি হাজার ঋষি এই স্থানে বসবাস করতেন সত্যযুগে এবং তাঁরা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন।

দধীচি স্মারক মন্দির

এখান থেকে পরমহংস গৌড়ীয় মঠে যাওয়ার পথে পড়বে আনন্দময়ী মাতার আশ্রম। একটু এগিয়ে হনুমানগড়ি। সেখানে বেশ বড় একটা মন্দির রয়েছে। নৈমিষারণ্যের এই বিশাল হনুমান মূর্তিটিও সিঁদুরে রাঙানো।

নৈমিষারণ্যের বুক চিরেই বয়ে গেছে গোমতী নদী। পুরাকালে এর নাম ছিল ধেনুমতি। পাশ দিয়ে হেঁটে এগোলেই নৈমিষ আশ্রম। আশ্রমের আকৃতি বিশাল নয়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে নৈমিষ ঋষির পাথরের মূর্তি। একসময়ে নৈমিষ ঋষি নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রটিতে দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন। যার নাম অনুসারেই এই অরণ্যের নাম হয়েছে নৈমিষারণ্য। এখনও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এখানে বসবাস এবং সাধনভজন করছেন।

চক্রতীর্থ থেকে ৯ কিমি দূরে অবস্থিত দধীচির আশ্রম। পুরো পথটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। দু'পাশে জঙ্গল ও মাঝখানে রাস্তা। দধিচীর আশ্রমে একটি বড় পুকুর রয়েছে। স্থানীয় মানুষের ভাষায় মিশ্রিক তীর্থ বা মিশ্রি তিরথ। দিঘির নাম দধীচি কুণ্ড। শোনা যায়, দধীচি ঋষি এই স্থানে আত্মত্যাগ করার আগে দেশের সব তীর্থস্থান থেকে জল এনে দেবতারা তাঁর শরীর ধুয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই দিঘি বা কুণ্ডটির জল পবিত্র মনে করা হয়। দিঘির পাড়ে স্মারক মন্দিরটি দধীচি মুনির। গর্ভমন্দিরে রয়েছে দধীচির একটি পাথরের মূর্তি। আশ্রমের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। কিছু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে মন্দিরের চারপাশে। প্রাচীন কাহিনী— বৃত্রাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত হলেন দেবতারা। জানতে পারলেন, একমাত্র দধীচির অস্থি দিয়ে নির্মিত বজ্রাস্ত্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে নিধন করা সম্ভব। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন দেবতাগণ। দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে এলেন দধীচির আশ্রমে। প্রার্থনা করলেন তাঁর অস্থি। উদারচেতা দধীচি দেবতাদের কল্যাণার্থে দিলেন প্রাণ বিসর্জন। এই বিশাল কুণ্ড যেখানে পৌরাণিক যুগে মুনিবর দধীচি দেহত্যাগ করেন। এই স্থানটি এখনও ত্যাগ ও তপস্যাক্ষেত্র হিসাবে মহান ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্য দান করে চলেছে। ■

দেশপ্রেম ও ইসলাম বন্দনার সমন্বয়সাধক নজরুল

রবীন সেনগুপ্ত

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৪ কার্তিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকায় 'আমি সৈনিক' নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন— এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ সৈনিক হতে পারবে। ...রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল রায়-রা বাংলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চির নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

এই জাতীয় সুন্দর জাতীয়বাদী বাক্যের রচয়িতা নজরুল তাঁর জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রায় বিরোধী ইসলাম সম্পর্কেও অনেক বন্দনামূলক কবিতা লেখেন। যেমন একটি কবিতায় তিনি লিখছেন— বাজিছে দামামা বাঁধবে আমামা/শির উঁচু করি মুসলমান/দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার/ ভাঙা কেল্লায় ওড়া নিশান।

কাবা ও হজরত রসুল সম্পর্কে নজরুলের প্রশস্তিমূলক কবিতার মধ্যে দু'টি লাইন এই রকম— 'বক্ষে আমার কাবার ছবি/ চক্ষে মোহাম্মদ রসুল/ শিরোপরি মোর খোদার আরশ/ গাহি তারি গান পথ যে ভুল।'

আর এক স্থানে নজরুল লিখছেন— নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম মোহাম্মদ বোল/ যে নাম নিয়ে চাঁদ-সেতারা আসমানে খায় দোল।

পূর্বোক্ত ধূমকেতু পত্রিকার ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২১ কার্তিক সংখ্যায় নজরুল পুনরায় ভারতবর্ষের জন্য 'ভিক্ষা দাও' প্রবন্ধে লিখলেন— ভিক্ষা দাও, ওগো পুরবাসী ভিক্ষা দাও। তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও। আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলবে— আমি ঘরের নই, আমি পরের নই, আমি

আমার নই, আমি দেশের। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই যে বলতে পারে আমি আছি, সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ওই পত্রিকারই অপর একটি সংখ্যায় নজরুল লিখলেন— ওঠো ওঠো, আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো, তোমাদের ডাক পড়েছে, রণ দুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে, তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল এ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। আমাদের বিজয় পতাকা তুলে ধরবার জন্য এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছোব না, বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন নিয়ে কাপড় ছাপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বল আমি আমি আমি পুরুষোত্তম। বল মাভৈঃ মাভৈঃ! জয় সত্যের জয়।

এই জাতীয় আদর্শ জাতীয়বাদী গদ্যের রচয়িতা নজরুল একবার এক মুসলমান সমাজের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতার সময় বলে বসলেন— 'আমি আল্লা ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করি না।' পরবর্তীতেও নজরুল 'ইসলামের জয় হোক' জাতীয় বাক্যও বলেছেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি প্রসঙ্গেও নজরুল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেটির শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তান— ফাঁকিস্তান'। এতে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। নজরুল একদিকে প্রায় সমস্ত প্রধান হিন্দু দেবদেবীর ওপর গান কবিতা লিখে দেশের জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বছরের পর বছর কালীমায়ের পূজা করে হিন্দু আধ্যাত্মিকতাকে সম্মান জানিয়েছেন। অপরদিকে মৃত্যুর পর আমায় এমন স্থানে কবর দিও যাতে আজান শুনতে পাই, কোরান পাঠ শুনতে পাই এমন বাসনাও প্রকাশ করেছেন। তাঁর সে বাসনা তাঁর জাতভাইরা পূর্ণও করেছেন। আজ বাংলাদেশ থেকে নজরুলের হিন্দুত্ববাদী গান কবিতাগুলি সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নজরুলকে তাই রক্ষা করার দায়িত্ব হিন্দুদেরই। ■

চিরদিনের শিক্ষা

যে দিন চলে গেছে

বুদ্ধদেব এক গ্রামে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ‘সকলকে ধরিত্রী মায়ের মতো সহনশীল আর ক্ষমাশীল হওয়া দরকার। রাগ এমনই আগুন যাতে সেই রাগ করা মানুষ অন্যকে জ্বালায়, নিজেও জ্বলে যায়।’

সভার সকলে শান্তভাবে বুদ্ধদেবের বাণী শুনেছিলেন। সেখানে খুব রাগী একজন লোক বসেছিল, যার ওইসব কথা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ সে মন দিয়ে শুনল। তারপর হঠাৎ চটেমটে বলতে শুরু করল, ‘তুমি ভণ্ডামি করছো! বড়ো বড়ো কথা বলা তোমার স্বভাব। তুমি লোকদের ভুল বোঝাচ্ছো। তোমার ওইসব কথা আজকের দিনে কেউ মানতে পারবে না।’

এসব কথা শুনেও বুদ্ধ শান্ত। ওইরকম কথা শুনে তিনি আঘাত পেলেন না। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আর সেটা লক্ষ্য করে রাগী লোকটা আরও চটেমটে বুদ্ধদেবের মুখে থুতু ছিটিয়ে ওখান থেকে চলে গেল।

পরের দিন লোকটার রাগ উবে গেল। তখন তার ভাবনা হলো, ‘ওই সাধু মানুষটি যা বলছিল তা ঠিকই তো। হঠাৎ রেগে গিয়ে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম! বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এখন কি করবো? তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই।’ রাগের পর সে অনুতাপে জ্বলতে থাকল। বুদ্ধদেবের খোঁজ করতে করতে সেই জায়গায় এলো যেখানে আগের দিন তাঁকে দেখেছিল। কিন্তু তিনি তো সেখানে নেই। শিষ্যদের নিয়ে দূরের অন্য গ্রামে চলে গেছেন। সেই লোকটা একে ওকে তাকে জিগগেস করতে করতে পৌঁছোল সেই জায়গায়।

বুদ্ধদেবকে দেখতে পেয়েই তাঁর পায়ে পড়ল। বলল, ‘আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।’

বুদ্ধদেব বললেন, ‘কে তুমি ভাই? তোমার কি হয়েছে? খামোকা ক্ষমা চাইছো কেন?’

লোকটি বলল, ‘আপনি কি ভুলে গেছেন প্রভু? আমি সেই লোক যে গতকাল আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। আমি বড়ই অনুতপ্ত। আমার খারাপ আচরণের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।’

ভগবান বুদ্ধ লোকটিকে হাত ধরে তুলে বললেন, ‘গতদিনকে তো আমি সেই জায়গাতেই ছেড়ে চলে এসেছি। আর তুমি এখনও সেই জায়গায় আটকে রয়েছো? তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছো। তোমার অনুতাপ হয়েছে। ব্যস, তোমার মন শুদ্ধ হয়ে গেছে।’

একটু থেমে বুদ্ধদেব বললেন, ‘এখন তুমি আজকের দিনে চলে এসো। সেই খারাপ কথা, খারাপ ঘটনার কথা যদি অনবরত ভাবতে থাকো তাহলে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুই-ই গোলমাল হয়ে যাবে। যে দিন চলে গেছে তার জন্যে ভেবে আজকের দিনটাকে নষ্ট কোর না।’

একথা শুনে লোকটার মনের সমস্ত চাপ যেন নেমে গেল। সে বুদ্ধদেবের পা ছুঁয়ে রাগ দূর করে ত্যাগ আর ক্ষমাশীলতার সঙ্কল্প নিলো।

বুদ্ধদেব তার মাথায় হাত রাখলেন আশিস জানিয়ে। সেই দিন থেকে রাগী লোকটা পুরোপুরি পালটে গেল। তার জীবনে অন্য ধারা বইল। সত্য প্রেম আর করুণার ধারা।

সে অন্যদের বলতে লাগল, ‘ভাই বন্ধুরা, আমরা অনেকেই আগের কোন দোষের কথা ভেবে ভেবে অনুতাপ করি আর তাতে আমি যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। আমাদের এরকম করা কখনও উচিত নয়। অন্যায় হয়েছে এই চেতনা যখন আসে তখনই সংকল্প নিতে হবে নতুন আবেগে উৎসাহে। সেই প্রেরণার আলোয় বর্তমানকে সুন্দর সুদৃঢ় করে তুলবো।’

হিন্দি থেকে অনুবাদ : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. স্বর্ণকুমারী দেবীর বাবার নাম? জন্ম মৃত্যু? তাঁর এক বিখ্যাত ভাইয়ের নাম?
২. 'রাজকাহিনী'-র লেখক কে? তাঁর দাদার নাম?
৩. 'ব্যোমকেশ' কোন লেখকের তৈরি চরিত্র?
৪. কাজী নজরুল ইসলাম-এর দুই পুত্রের নাম?
৫. 'অপু-ট্রিলজি'-র পরিচালক কে? কাহিনীকার? ছবির নাম?

উত্তর : ১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৫-১৯৩২। রবীন্দ্রনাথ। ২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ। ৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. কাজী সব্যসাচী। কাজী অনিরুদ্ধ। ৫. সত্যজিৎ রায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার।

ফিরে পড়া

কাজের লোক

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
(১৮৫৯-১৯৩৯)

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ঐ ফুল ফুটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

ছোটপাখি, ছোটপাখি,
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।
এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

পিপীলিকা পিপীলিকা
দল-বল ছাড়ি একা
কোথা যাও, শুনি যাও বলি।
শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পিলপিল চলি।

মগজ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে মেয়েদের কথা ভাবতে হবে

দীপা হাতি

'মা' শব্দটা বড়ই মধুর আমাদের কাছে। ভারতবর্ষের মানুষজন 'মা' বলতেই পারলেই যেন ধন্য হয়ে যায়। মা হলেন জন্মদাত্রী। আমরা আমাদের মেয়েদেরও মা বলি। মাতৃস্থানীয়া যাঁরা তাঁদের তো আমরা মা বলিই। যেমন জেঠিমা, কাকিমা, পিসিমা, মামিমা ইত্যাদি। আবার কন্যাস্থানীয়া যারা তাদেরও আমরা মা বলি, যেমন বৌমা। পুত্রবধূকে আমরা এই নামেই ডাকি। বৌ নামের সঙ্গে মা যুক্ত করে বৌমা। আমরা মেয়েদের মা বলতেই ভালবাসি। এটাই আমাদের সংস্কৃতি। দিনে দিনে আমরা আধুনিকতা দেখাতে গিয়েই আমাদের বিপদ ডেকে এনেছি। বৌমা না বলে আমরা আধুনিক হয়ে নাম ধরেই ডাকছি। বলছি বৌমা তো মেয়ের মতো। মেয়েকে যেমন নাম ধরে ডাকি ওকেও তেমন। ভালো, এতে অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়। আসলে একটু একটু করে আমরা নিজেরাই সমাজের শক্ত বাঁধনটাকে আলগা করে দিয়েছি। এই আলগা বাঁধন দিয়েই বিপদ প্রবেশ করেছে।

মেয়েরা বড় হলেই আমাদের রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা পাঁচ বছর থেকে আট-নয় বছর পর্যন্ত আমাদের মনে চিন্তা ধরায় না। এরপর তার বয়স একটু একটু করে বাড়তে থাকলেই আমাদের চিন্তা বাড়তে থাকে। আমরা তো আধুনিক। এটা তবে কেন হয়? আসলে আধুনিকতা একটা দেখানোর ব্যাপার। এর ছোঁয়াচ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এই তো কয়েকদিন আগে ফেসবুকে একটা ছবি দেখলাম। ওই ছবিতে দু'জন বিদেশিনী শাড়ি পরে আছেন, অন্য দুজন আমাদের দেশের মেয়ে তারা পশ্চিমি পোশাক পরে আছে। পশ্চিমিরা আমাদের পোশাক যখন পছন্দ শুরু করেছে, তখনি আমরা ঘটা করে ওদের ফেলে দেওয়া পোশাক পরে আধুনিক হচ্ছি। পোশাকই মেয়ে থেকে মায়ে পরিণত করে। মা ডাকের প্রতি যে শ্রদ্ধা থাকে তখন মেয়েটির প্রতি সেই শ্রদ্ধা মনে মনে উদ্রেক হয়। তাই তো কবি বলেছেন— 'বাংলার বধূ বুক ভরা মধু', 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান।' এই মা বলতে মনটা আনচান করার ব্যাপারটাই হলো ভারতীয় সংস্কৃতি।

আজ যখন পথে ঘাটে মেয়েরা অসুবিধায় পড়ে তখন আমার নিজের বড়

খারাপ লাগে। বলার কিছুই থাকে না। যে সমস্ত কিশোরী বা যুবতী ছেলেদের কুনজরে পড়ে, কুবাক্য শোনে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পোশাকই দায়ী থাকে। আজকাল এই পোশাকের দোষ দেওয়া যাবে না। তা হলেই নারীবাদীরা নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে চিৎকার করে উঠবে। যে পোশাক আমাদের মাধুর্য বাড়ায় সেই পোশাক আমাদের পরতে দোষ কোথায়? আমি মোটেই সালোয়ার, জিনস্, প্যান্টের বিরোধী নই। অনেকেই তা পরেন। তা পরে তাঁদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলেন। অসুবিধা শুধু উগ্রতা নিয়ে। সৌন্দর্যের বদলে উগ্রতা কখনই কাম্য নয়।

আসলে বেশ কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এর জন্য দায়ী। যখনই পোশাক নিয়ে কোনো কথা কেউ বলেছেন, দেখবেন তাঁরা তেড়ে এসেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে এঁদের অধিকাংশই মেয়েদের শ্রদ্ধা করেন না। এঁরা লোকদেখানো কথা বলেন। এঁরা মস্তিষ্ক থেকে কথা বলেন। মেয়েদের সমস্যা বুঝতে গেলে হৃদয়ের ভাষায় বুঝতে হবে। হৃদয়হীনরাই বড় বড় কথা বলেন। আমার তো মনে হয় মেয়েদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, আমাদের পরিবারের মধ্য থেকেই শুরু করতে হবে। পরিবার থেকে সমাজে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রব্যাপী ভাবনা ভাবা যাবে। পরিবারের মধ্যে মেয়েদের, বাড়ির বউদের, বা কাজের মাসিদের অপমান করে সমাজে নারীমুক্তির পক্ষে গলা ফাটালে আখেরে কোনো কাজ হবে না। মেয়েদের বিপদ যেখানে ছিল তা সেখানেই থাকবে। আমরা যদি পরিবারের মধ্যে আমাদের মেয়েদের সম্মান করতে পারি বা তাদের 'মানুষ' ভাবি তা হলে সমাজে তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। শুধু এর অভাবেই প্রতিদিন আমরা মেয়েদের অপমানিত হওয়ার খবর পাই। সমাজ বদল করতে গেলে সময় লাগবে। শুধু আইন দিয়ে যেমন সমাজের বদল হবে না, তেমনি আইনকে দুর্বল করলেও চলবে না। আইন ভঙ্গকারীদের কড়া হাতে মোকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো চলবে না। আজকের দিনে এই রাজনৈতিক প্রভাবই মেয়েদের ভীষণ ক্ষতি করছে। মেয়েদেরই এর বিরুদ্ধে একজোট হতে হবে। সেটাই হবে আসল নারীবাদী আন্দোলন। শুধু পোশাক নিয়ে কথা বললেই নারীবাদী হওয়া যাবে না।

অতীতে যেমন আমরা লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতীকে দেখেছি, তেমনি সাম্প্রতিককালে আমরা কিরণবেদী বা দময়ন্তী সেনকেও দেখেছি। মেয়েদের দায়িত্ব মেয়েদেরই নিতে হবে। সাবাস রোহতকের সাহসিনী দুই বোন— পূজা ও আরতি। ইভটিজারদের বেল্ট দিয়ে পিটিয়েছেন। আসলে একের অপমানে অন্যের মনে আঘাত অনুভব হলেই আজকের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। ■

ভরসা বাড়ছে, ভারত এগোচ্ছে

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

মহারাষ্ট্রবাসীর কাছে ফরিদ জাকারিয়া কোনো নতুন নাম নয়। কেননা তিনি রফিক জাকারিয়ার পুত্র। রফিক জাকারিয়া মহারষ্ট্রের ঔরঙ্গবাদ থেকে বহুবার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং বিধানসভায় বরিষ্ঠ মন্ত্রীরূপে কাজও করেছেন। পাঠকের ভালোভাবেই মনে পড়বে যে, ফরিদ জাকারিয়ার মা ফতিমা জাকারিয়া খুশবন্ত সিংহের সঙ্গে ইলাস্টেড উইকলির সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। এজন্য এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, সাংবাদিকতা তাঁর রক্তের মধ্যেই আছে। ফরিদ জাকারিয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমেরিকার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক'-এর সিনিয়র এডিটর হিসেবেও কাজ করেছেন। এই সময় তিনি সি এন এন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। একজন ভারতীয় হওয়ার জন্য তিনি ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিছুদিন আগেই তাঁর চ্যানেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। জাকারিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আলকায়দার আলজাওয়াহিরির ভারতে জঙ্গি সংগঠন খোলার

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' — স্লোগানে মোদীর প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস বেড়েছে।

ঘোষণার বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন মাত্র দুটি শব্দে বলেন যে, জঙ্গি সংগঠন ও ইসলামিক স্টেটের ধ্বজাধারীদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, ভারতীয় মুসলমানরা তাদের কথায় নাচতে শুরু করবে। তাদের মনে যদি এটা থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে তারা ভারতীয় মুসলমানদের চিনতেই পারেনি। তারা জানে না যে, ভারতীয় মুসলমানরা নিজের দেশের জন্য কীভাবে প্রাণ দেওয়ার জন্য তৈরি থাকে। ভারতের সম্পর্কে তাদের যদি কণামাত্রও জ্ঞান থাকে তাহলে ইতিহাসের পাতা উলটে দেখে নিক— স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কীভাবে যুদ্ধ করেছে। ধর্ম অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতি সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রাণ দেওয়া মুসলমানদের নাম সম্ভবত জওয়াহিরি ও তার দলবল জানে না। ভারতে যখনই পাকিস্তানের দাবি উঠেছিল তখন তার বিরোধিতাকারী খান আবদুল গফফর খাঁ এবং আবুল কালাম আজাদ কে ছিলেন? এই তথ্য তাদের জানা উচিত। ভারতে যদি বাহাদুর শাহ জাফর না থাকতেন তাহলে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ অধরাই থেকে যেত। এরকম আবোল তাবোল তারাই বলতে পারে যাদের ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান নেই। মোদী তাদের কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছেন। পাকিস্তান বারবার ভারতের ওপর হামলা করে চলেছে কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা ওই দুষমনদের মুখের ওপর এমন জবাব দিয়েছে যে তাদের মুখ দেখাবার জায়গা থাকছে না। এজন্য কেউ যদি ভারতীয় মুসলমানদের মূল্যাঙ্কন করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই এরকম মনগড়া কথা বলা যেতে পারে।

মোদীর এই কথার পর একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, তিনি মনে প্রাণে মুসলমানদের আপনার জন ভাবেন। কোনোরূপ ভ্রান্তি বা কটুতা তাঁর মনে নেই। ভারতের মুসলমানরা রাষ্ট্রভক্ত এবং তাঁরা এই দেশের জন্য বাঁচবে ও মরবে। ভারতের মুসলমানরা দেশের সীমার জন্য বা উন্নতির জন্য কোনোরকম সন্দেহ রাখেন না। কোটি কোটি হিন্দুর মতো তাঁদের মনেও দেশের জন্য সমান ভাবনা আছে। এজন্য আলকায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির কানখুলে শুনে নেওয়া প্রয়োজন যে, ইসলামের নামে ভারত ভাগ করা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাবার তাদের যে স্বপ্ন তা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। ভারত থেকে আলাদা হওয়া অথবা ভারতকে টুকরো টুকরো করার কথা বললে এখানকার মুসলমানরা দেশভক্তের মতো মুখের ওপর যোগ্য জবাব দেবে। সুতরাং জঙ্গি সংগঠনগুলির এদেশে কোনোরকম স্থান পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই।

এই সাক্ষাৎকারের ফলে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, মোদী এবং তাঁর সরকারের ওপর ভারতীয় মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস

ফঃ ৪

আছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের যেভাবে আহ্বান জানাবেন তাতে তাঁরা আন্তরিকভাবেই সাড়া দেবেন। বাইরের কোনো দুষ্টশক্তি এখানকার মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। মোদীর এই জবাব নিশ্চিতভাবেই ওই জঙ্গিদের মুখে প্রবল চপেটাঘাত যারা ইসলামের নামে এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে চাইছে। যদি পাকিস্তানিদের মনে এরকম মিথ্যা ভ্রম থাকে তবে তারা এখনই তা দূর করুক। ভারতের এক এক ইঞ্চি জমি ভারতের মুসলমানরা রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে। পাকিস্তান যদি ভারতের মুসলমানদের নিয়ে মজহবের রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাদের নিরাশ হতে হবে। কেননা দেশের প্রতি আনুগত্য ভারতের মুসলমানদের প্রথম পরিচিতি। এজন্য বিদেশের কোনো জঙ্গি সংগঠন ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা যেন না করে। যদি করে তাহলে মুসলমানরাই ইঁটের জবাব পাথরে দেবে। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের রাজনীতি যখন ডামাডোল অবস্থায় ছিল তখনও মুশারফ ভারতীয় মুসলমানদের নিশানা করে নানা খেলা শুরু করেছিলেন। নিজের দুর্বলতা ঢাকতেই তাঁর নজর ছিল ভারতের মুসলমানদের ওপর। তাতে পাকিস্তানের আশা পূর্ণ হয়নি। বস্তুত পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসবাদীদের 'শয়তানের আড্ডাস্থল'-এ পরিণত হয়েছে। সেখানে শিয়া-সুন্নির ভেদ নির্মাণ করা চলছে। আবুবকর আলবগদাদির মতো নরপশুদের সমর্থন করা হচ্ছে। সেজন্য ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে মুখের মতো জবাব পাবে। মোদী সি এন এন-কে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দেশভক্ত ও উদার মুসলমানরা প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করেছেন। গুজরাটে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার জন্য মোদীর খুব বদনাম করা হয়েছে, কিন্তু তার একটাও প্রমাণ তারা প্রস্তুত করতে পারেনি যার দ্বারা মোদীকে কলঙ্কিত করা যায়। মোদীর বিরুদ্ধে একজনও সাক্ষী পাওয়া যায়নি বা কোনো আদালতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। মোদীর বিরুদ্ধে ১০/১৫ বছর ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তিনবার নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাজনীতির স্বার্থে একশ্রেণীর মুসলমান ক্রমাগত কোনো না কোনো দোষ লাগিয়েই চলেছে। মোদীর ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের উত্তেজিত করার নানা চেষ্টা চলছে। এজন্য মুসলমান সংখ্যাধিক্য উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে দাঙ্গার আগুনও জ্বালানো হয়েছে এবং ভোটের মেরুকরণ করা হয়েছে। মোল্লা-মৌলভি ও রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের মঞ্চ থেকে বলেছেন— মোদীর বিরুদ্ধে জিততে পারে একরকম যে কোনো দলের যে কোনো নেতাকে জেতানো মুসলমানদের পক্ষে লাভজনক হবে। কিন্তু এরকম ষড়যন্ত্র বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে। মোদীকে মুসলমানরা মন খুলে ভোট দিয়েছে। তার ফলে বিরোধীদের মতলব মাঠে মারা গিয়েছে।

মোদীর বিরুদ্ধে এরকম পরিবেশ যারা নির্মাণ করতে চেয়েছিল তারা একেবারে হেরে ভূত হয়েছে। মোদীর বিরুদ্ধে যতরকম অভিযোগ আনা হয়েছে, মুসলমানরাই তা খণ্ডন করার ফলে নেতাদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের ওপর মোদী বিশ্বাস রেখেছেন, মুসলমানরাও তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে মোদীর ওপর ভরসা রেখেছেন। বুখারির মতো নেতারা আজেবাজে বয়ান দিয়ে চলেছে কিন্তু মোদীর ব্যবহার সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির এমন অবস্থা করছে যে তারা মুখ লুকানোর জায়গা পাচ্ছে না।

কিছুদিন আগে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে নির্বাচন হয়ে গেল। একজনও মুসলমান নেতা তাঁর সম্পর্কে আজেবাজে শব্দ বলতে পারেননি কিংবা সভায় বলা মোদীর একটা কথা খণ্ডন করতে পারেননি। মহাভারতের যুদ্ধে যেসময় সব জায়গায় কৃষ্ণকেই দেখা যাচ্ছিল, সেরকম যে কোনো রাজ্যের নির্বাচনে কেবলমাত্র মোদীরই উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। সমস্ত জনসভাই তাঁর জনসভায় পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। বুখারির মানসপুত্র নেতারা ভাবছিলেন যে, মুসলমান যুবক-যুবতীরা আলবাগদাদির ফৌজে সামিল হয়ে জেহাদিদের পাল্লা ভারী করবে। তা না হয়ে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের ফলাফল যখন সামনে আসতে শুরু হলো দেখা গেল মুসলমানদের মুখে ও মনে শুধুই মোদীর নাম। মুশারফ ও নওয়াজ শরিফের আশা ছিল, ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁরা হতাশ হয়ে গেলেন যখন দেখলেন সব স্থানেই মুসলমানরা তাঁদের নেতা হিসেবে মোদীকেই স্বীকার করেছেন। মোদীর নেতৃত্বে যতগুলি নির্বাচন হলো তাতে ভারতীয় জনতা পার্টির পাল্লাই ভারি দেখা গেল। কেননা তুলনা করার মতো কেবল একটাই নাম তা হলো মোদী। জনসভাগুলিতে মোদীকে দেখে ভারতের মুসলমানদের মনে হচ্ছিল শুধু মোদীই তাঁদের বিশ্বাসের স্থল। কেননা মোদী মুসলমানদের ভক্তি ও শক্তি দেখেছেন যারা কেবল দেশের জন্যই সমর্পিত।

গত ৬৭ বছরে ভারতের মুসলমানরা এই প্রথম অনুভব করছেন যে, তাঁদেরও বিশ্বাস করার মতো কোনো নেতা আছেন, যিনি তাঁদের যোগ্যতা ও সমর্পণের সঙ্গে পরিচিত। তিনি ভারতের সেই নেতাদের মতো নন, যিনি যে কোনো ব্যর্থতার জন্য মুসলমানদের দায়ী মনে করেন। সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা মোদীর যে কথা শুনে শুনেছেন তাতে ভোটের সমীকরণ বদলে গেছে। এখন মুসলমানদের ভিড় ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে বাড়ছে। তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে, কেননা এই প্রথম তাঁদের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে। এজন্য সেনাবাহিনী বা উৎপাদন ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের কারণে মোদীর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হচ্ছে। এই দুই পরিবর্তন বা বিশ্বাস ভারতের গণতন্ত্রে এক নতুন ইতিহাস নির্মাণ করেছে। দুয়ের সংকল্প সঙ্কেত দিচ্ছে--- ভারতের উন্নতিতে মুসলমান এবং মুসলমানদের উন্নতি ভারতেই নিহিত। ■

উপত্যকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বন্যা বিধ্বস্ত সনোয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইন্দিরা নগর অঞ্চলে এখন তাপ শূন্যাঙ্কের নিচে শুধু নয়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যে কোনো সময় বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে। ঠিক এমন জায়গাতেই তাঁর প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীমতী দরক্ষণ আন্দ্রাবি। নিরলসভাবে ঘুরে চলেছেন প্রত্যেকটি ভোটারদের বাড়ি। আর তার ফলেই উত্তেজনায় টগবগ করছে ভূস্বর্গ। তবে কি এখানেও প্রথমবার প্রস্ফুটিত হতে চলেছে কমল? শ্রীমতী আন্দ্রাবির প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু যে সে লোক নন, খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। একবারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জা দেওয়ার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তুমুল আত্মবিশ্বাসী আন্দ্রাবি জানাচ্ছেন, ওমর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই নন। এই ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি উভয়েই আমাদের রক্তের বিনিময়ে রাজ করে গেছে। আমি জিতবই। আন্দ্রাবির ক্ষোভ কংগ্রেস মুসলমানদের সঙ্গে শুধু 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' নীতি নিয়ে চলেছে। আজ কাশ্মীরের তরুণ-তরুণীরা এই বাদশাহি খানদানি রাজনীতির অবসান চান। চান পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনেরই বার্তাবাহক হলো বিজেপি। তারাই আনবে পরিবর্তন— এ বিশ্বাস তাঁদের বদ্ধমূল।

এই নতুন ইঙ্গিতকে ধরেই বিজেপিও সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নির্বাচনী প্রচার উঠেছে তুঙ্গে। উপত্যকার দোকানপাঠ ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে যা কখনও দেখা যায়নি মোদী-অমিত শাহ জুড়ির পোস্টারের ছড়াছড়ি। বহু বাড়ির ছাদ থেকে পত পত করে উড়ছে গেরুয়া পতাকা। কিছু সূত্র অনুযায়ী পিপলস রিপাবলিকান দল নামে একটি নতুন দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে যারা যথেষ্ট মুসলমান ভোট কাটার ক্ষমতা রাখে।

এদিকে দলের তাত্ত্বিক নেতা রামমাধব, শাহানওয়াজ হুসেন, বিখ্যাত বলিউড তারকা কাশ্মীরি পণ্ডিত অনুপম খের বা অশোক পণ্ডিতের মতো হেভিওয়েটরা শ্রীনগরে ঘাঁটি গেড়েছেন বিজেপি-কে জেতাতে। অনুপমের কথায়— ''দেখে অবাক লাগে অত বড় বন্যার তাণ্ডবের পরও মানুষের মধ্যে কী বিপুল উদ্দীপনা।''

সংবাদে প্রকাশ, বিজেপি-র পক্ষে নির্বাচনী প্রার্থীদের অধিকাংশই তরুণ, শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী। উপত্যকার ৪৬টি আসনের মধ্যে দল লড়ছে ৩৩টি আসনে। প্রার্থীদের ২৮ জন মুসলমান, ৪ জন পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ও ১ জন শিখ। আবার ৩ জন অতি উল্লেখযোগ্য মহিলা প্রার্থী রয়েছেন নির্বাচনী যুদ্ধে। এঁদের মধ্যে প্রথমজন উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবি ৩৮ বছর বয়স্কা শ্রীমতী দরক্ষণ আন্দ্রাবি, দ্বিতীয়জন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নীলম গশ। বত্রিশ বছরের এই শিয়া সম্প্রদায়ের মহিলা লড়ছেন 'জাদিবেল' কেন্দ্র থেকে এবং তৃতীয়জন হলেন ৩৪ বছরের হীনা ভাট। তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র 'আমিরা কাদাল'।

দরক্ষণ আন্দ্রাবি

হীনা ভাট

নীলম গশ

কাশ্মীর উপত্যকায় বিজেপি মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন খালিদ জেহাঙ্গির। তিনি পেশায় ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক। গত মার্চ মাসে জম্মুর এক সভা থেকে এঁকে আবিষ্কার করেন মোদী। তিনি তাঁকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন। সেই শুরু— দলে আজ নিবেদিত প্রাণ খালিক। এখন তাঁর বিস্মিত উপলব্ধি ৩৭০ ধারা আদতে কাশ্মীরকে কি দিয়েছে? শুধু ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন এক রাজকীয় শ্রেণী। তাঁরা বাস্তবে বিগত শতাব্দীর মানসিকতায় উপত্যকা জুড়ে একচেটিয়া আধিপত্য জারি রাখতে চান। এঁরা থাকেন গুপকার রোডের

প্রাসাদোপম আবাসে আর কাশ্মীরি আমজনতা থাকেন বস্তিতে।

অন্যদিকে, নীলম কাজ করেন গুরগাঁওয়ের এক সফট্ওয়ার কোম্পানিতে। তিনি বিশ্বাস করেন বিজেপি-ই একমাত্র দল যারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা ধরে। কাশ্মীরের যুবকেরা না বুঝে শিকার হয়েছে সন্ত্রাসবাদ আর বিচ্ছিন্নতাবাদের। তাদের অনেকেই আজ নেশাগ্রস্ত নয়ত অবসাদের রুগী, একমাত্র বিজেপি-ই এদের বদলাতে পারবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বন্যা বিধ্বস্ত কাশ্মীরে গ্রামের পর গ্রামে ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন নীলম। থকথকে কাদায় ভরা পথে যতই শ্রান্ত হন না কেন, ভারতের ডাকসাইটে সুন্দরীদের দেশ কাশ্মীরের রাস্তা এই মহিলাদের রূপচ্ছটায় ঝলমলে হয়ে উঠছে। তাঁদের মুখশ্রীর আশ্চর্য সরলতা চতুর্দিকের ধ্বংসকে আরও প্রকট করে তুলছে। এই বন্যা কবলিত পরিস্থিতির প্রসঙ্গে ক্ষোভ ব্যক্ত করে তিনি মানুষকে বলছেন, সেই ঘোর দুর্দিনে কাশ্মীরি জনতাকে কেউ সাহায্য করেনি। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর অসমসাহসিক ও আন্তরিক উদ্ধারকার্যেই মানুষ প্রাণে বেঁচেছে।

এরপরই ছিল অবাক হওয়ার পালা। আচ্ছা, একজন মুসলমানের পক্ষে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রার্থী হওয়া কি ঘোর স্ববিরোধিতা নয়? সাংবাদিকের এই প্রশ্নে ফুঁসে ওঠে তিনি বলেন— তাহলে কি ধরে নিতে হবে কোনো মৌলানাই কংগ্রেস দল পরিচালনা করেন তা তো নয়। কংগ্রেসদল পরিচালনা করে হিন্দুরা। বিজেপিও পরিচালিত হয় হিন্দুর দ্বারা। তাহলে তফাতটা কোথায়? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন— বলুন তো, কিস্তওয়ার দাঙ্গার পর সকলে কি দাঙ্গার জন্য ওমর আবদুল্লাকে দায়ী করেছিল? তেমন গুজরাট দাঙ্গার ক্ষেত্রেও মোদীজীর কোনো ভূমিকা ছিল না। মনে রাখবেন, কোনো মুখ্যমন্ত্রীই তাঁর রাজ্যে দাঙ্গা হোক এটা চান না।

আরও চমক অপেক্ষা করেছিল সংবাদমাধ্যমের জন্য। নির্বাচনে হেরে গেলে সব প্রার্থীই কি বিজেপি ছেড়ে চলে যাবে? এবার প্রার্থী উর্দু কবি ও গবেষক শ্রীমতী আন্দ্রাবি গর্জে উঠে বলেন, ''আমি একজন যথার্থ মুসলমান, আর ইসলাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার। আমি যদি সুযোগসন্ধানী হতাম তাহলে পিডিপি-তে যোগ দিতাম। হার কি জিত আমি কখনই বিজেপি-কে ছাড়ব না। কেন না আমি মনে করি— ''বিজেপি মেরী মাঁ হ্যায়''। ওদিকে জাদিবল কেন্দ্রের প্রার্থী নীলম বলেন, উপত্যকায় দরকার শিল্প, কলসেন্টার ও নানান অর্থনৈতিক উদ্যোগ। অথচ কংগ্রেস ও পিডিপি বলছে, আমাদের কাশ্মীরি মুখ্যমন্ত্রী চাই। কিন্তু এই কাশ্মীরি মুখ্যমন্ত্রীরা বাস্তবে উপত্যাকাকে কি দিয়েছে। সেই সঙ্গে গুজরাটে মদ্যপানের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ইসলামে নেশা করা নিষিদ্ধ। গুজরাটে নারীরা এই কারণে অনেক বেশি সুরক্ষিত। এটি মোদীজীর অতুলনীয় কীর্তি। সারা ভারতে এমন একটা পরিবেশই তাঁর কাম্য।

কাশ্মীরবাসীদের হতাশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আন্দ্রাবি প্রধানমন্ত্রীর থেকে একটি 'কাশ্মীরি প্যাকেজ' প্রত্যাশা করছেন। যাতে কাশ্মীর উন্নয়নের সর্বোচ্চ যোগান অর্থে 'জন্নত' হতে পারে। তাঁর তরুণ সমর্থকরা জানালেন বন্যায় ভেঙে পড়া বাড়ির জন্য তাঁরা সরকারের থেকে সামান্য ৭৫ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। এটি করুণার দান ছাড়া অন্য কিছু বলে তাঁরা মনে করেন না। তাঁরা প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছেন মোদীর দিকে যাতে বন্যাবিধ্বস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন হয়।

এমনি এক বিজেপি কর্মী ইনায়েতের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। তিনি অন্য রাজ্যে 'তাজ হোটেল'-এ একটি চাকরি জুটিয়ে অফিসে হাজিরা দেওয়ার আগেই কাশ্মীরি বুঝতে পেরে পুলিশ তাকে মাঝপথেই আটকে দেয়। তাঁর কথায় ভারতের অন্য রাজ্যে তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। আমরা দিল্লী, মুম্বই কোনো জায়গায় ঘর ভাড়া পাই না। অথচ কাশ্মীরে আমাদের কোনো জীবিকা নেই।

এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকেই মুক্তি চাইছে কাশ্মীরের তরুণ- তরুণীরা। মহিলা প্রার্থীদের কায়েমি স্বার্থবাজরা বলছে 'গদ্দার'। বাড়িতে অভিভাবকরা তুমুল আশঙ্কায়। সরকার তাদের অস্পৃশ্য করে দিয়েছে। জঙ্গি লস্করের বাহিনী বলছে 'হর হর মোদীর স্লোগান ঘর ঘর মোদী' বানিয়ে ছাড়বে। এমনই একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কাশ্মীরের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নবীন প্রজন্ম বিজেপি-কে আঁকড়ে পরিবর্তনের জন্য জান কবুল করছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

মরণোত্তর দেহদানের সচেতনতা বাড়লে বহু মানুষ নতুন জীবন পাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৩ আগস্ট অঙ্গদান দিবস। ভারতে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষের কোনো-না-কোনো অঙ্গ পরিবর্তন প্রয়োজন। তার মধ্যে রয়েছে কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র, প্যানক্রিয়াস এবং আরও কিছু। প্রকৃত চিত্রটা হলো বছরে অঙ্গ পরিবর্তন বা ট্রান্সপ্লানট ঘটে প্রায় হাজার খানেক। কোথায় পাঁচ লক্ষ আর কোথায় এক হাজার! অনেকের মৃত্যু হয় অঙ্গদাতার সংখ্যা যথেষ্ট না থাকায়। অথচ ভারত হলো দ্বিতীয় জনসংখ্যাবহুল দেশ। মৃত্যুর হার বেশি জন্ম হারের সঙ্গে তাল রেখে। কিন্তু এদেশের সমাজজীবনে অঙ্গদান এখনও কোনো গুরুত্ব পায়নি। দেহাবসানের পর মৃতের কয়েকটি অঙ্গ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে তা কয়েকজন মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন সম্ভব। আর তার মাধ্যমে সেই অসুস্থ মানুষটি নতুনভাবে ফিরে পেতে পারেন স্বাভাবিক জীবন। যেমন মৃতজনের দু'টি চোখ থেকে কর্নিয়া নিয়ে দু'জন দৃষ্টিহীনের চোখে আলো আনা সম্ভব। মৃত মানুষটির দেহ প্রথানুসারে সৎকার কর্মের আগে অত্যন্ত মহান সৎকাজে এভাবে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু আপশোসের কথা, আমাদের দেশে এখনও চেতনা জাগেনি ঠিকভাবে। অথচ এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশ। সেসব দেশে মরণোত্তর দেহদান- আন্দোলন সার্থক রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশে সবকিছুর মধ্যে যেরকম স্লোগানসর্বস্বতা প্রবল এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোঁড়ামি। যে দেহ মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দাহ বা কবর দেওয়ার রীতি আছে তাতে অসুস্থ মানুষের দেহে পুনঃস্থাপন উপযোগী অঙ্গগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ একটু সচেতনতা থাকলে মস্তবড় কাজ করা সম্ভব। কিন্তু সেটারই বড় অভাব।

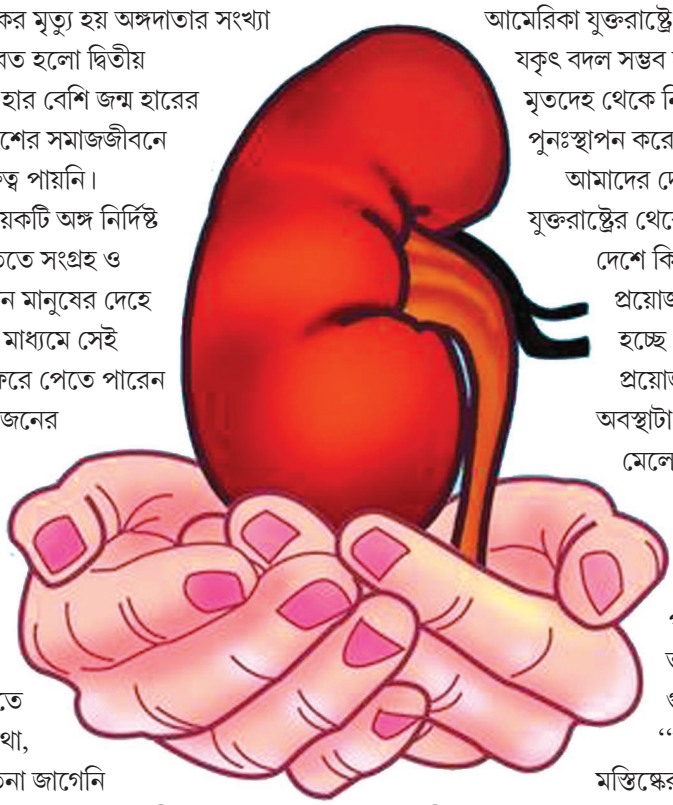

এর দরুন দেশের অধিকাংশ মানুষ খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে যুক্তি বুদ্ধির আলোয় সবকিছুর বিচার করতে শেখেনি। বিনা প্রশ্নে এবং প্রতিবাদে বহু যুগ ধরে লালিত কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসকে মেনে নিয়ে তারই সপক্ষে জাবর কাটা চলে বংশ পরম্পরায়। বিদেশে অঙ্গদান বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক স্তরে। ক্রমাগত প্রচারে সাড়া মিলেছে যথেষ্ট।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬ হাজার মানুষের যকৃৎ বদল সম্ভব হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে মৃতদেহ থেকে নিয়ে অসুস্থ মানুষের দেহে পুনঃস্থাপন করে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থেকে চারগুণ বেশি। আমাদের দেশে কিডনি পুনঃস্থাপন হওয়ার প্রয়োজন ছিল বছরে ২৪ হাজার। হচ্ছে ২৫০ জনের সামান্য বেশি। প্রয়োজনের চিত্র আর প্রকৃত অবস্থাটা বিশ্লেষণ করলে যে চেহারা মেলে তা তো ভয়ঙ্কর। অজ্ঞতা হলো এক্ষেত্রে মস্তবড় বাধা। এমনকী চিকিৎসকরাও অনেকে রোগী ও রোগীদের পরিবারের সদস্যদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার গুরুত্ব অনুভব করেন না। ''অনেক চিকিৎসক রোগীর মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটার কথা ঘোষণায় আগ্রহী নন। তার বদলে তাঁরা রোগীকে ভেন্টিলেশনে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাখতে চান। আমরা কখনও রোগীর পরিবারের লোকজনকে বলতে পারি না দেহদানের কথা যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তার মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘোষণা করছেন।'' একথা বলেছেন অঙ্গদানের আন্দোলনে সক্রিয় আমেদাবাদের শতায়ু সংস্থার পক্ষ থেকে ভাবনা ছাবারিয়া।

''পুলিশেরও জানা দরকার মস্তিষ্কের মৃত্যু ব্যাপারটা। বিশেষ করে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত দিলে চটপট এবং সহজে অঙ্গদান সম্ভব। যে মানুষটি মারা গেছে তার অঙ্গ অন্যভাবে কাজে

লাগানো সম্ভব, তা কয়েকজনের জীবনকে অন্য রূপ দিতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এজন্যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তামিলনাড়ু সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। থানা থেকে 'অঙ্গ গ্রহণে আপত্তি নেই' এই সার্টিফিকেট নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে জানানো দরকার। এর ফলে তামিলনাড়ুতে অনেক জীবন রক্ষা করা গেছে। আর 'আপত্তি নেই' এই সার্টিফিকেট পুলিশের কাছ থেকে দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে।" একথা জানিয়েছেন গিফট ইয়োর অর্গান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রিয়াঙ্কা শৈলেন্দ্র।

''অনেক কারণ আছে অঙ্গদানের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে কারও জীবন রক্ষা পেত তা নষ্ট হয়ে যায়। মৃতের অঙ্গ খুব সহজে মেলে। অঙ্গদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না, কারণ অঙ্গদাতা তখন মৃত। আমরা আশাবাদী আইন যখন চালু হয়েছে তখন অনেকে এগিয়ে আসবেন আগ্রহে।" 'একথা বলেছেন ডাঃ সমীরণ নন্দী। যিনি স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে সার্জিক্যাল গ্যাসট্রোএন্ডোলজি বিভাগে যুক্ত। ডাঃ নন্দী ১৯৯৪ সালে দেশে অঙ্গস্থাপন নিয়ে যে কমিটি তৈরি হয় তার খসড়াটা তৈরি করেন।

কয়েক হাজার মানুষ অঙ্গদানের সম্মতি জানান। কিন্তু সেই অঙ্গ মৃত্যুর পর কীভাবে গ্রহণ করা হবে সে সম্বন্ধে কোনোরকম উদ্যোগ দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যেরকম গুছোন উদ্যোগ থাকা দরকার তা নেই। এবং অঙ্গদাতার আত্মীয় পরিজন অঙ্গীকারের কথা ভুলে যেতে চান অনেকটা স্বেচ্ছাতেই। তথ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি নেওয়া জরুরি।

অঙ্গদানের ক্ষেত্রে কোনো কোনো রাজ্য উদ্যোগ নিয়েছে আন্তরিকভাবে। সমস্ত রকম তথ্য রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলে তা যাতে ঠিকভাবে রূপ নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যাঁরা অঙ্গদান করেছেন, যাঁদের দেহে অঙ্গ পুনঃস্থাপন হচ্ছে তার তালিকা থাকা দরকার।

এদেশে মানবদেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন চালু হয় ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৫ থেকে এখনও পর্যন্ত বড়জোর ১৬ হাজার কিডনি পুনঃস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এই ১৬ হাজারের মধ্যে ৪ শতাংশ মৃতের অঙ্গদানের অঙ্গীকার থেকে, এটা ২০১৩ সালে দেখা গিয়েছিল। অঙ্গ পুনঃস্থাপনে ওই বছরটাকে সেরা বছর বলা যায়। ৮৫২টি অঙ্গ পুনঃস্থাপনের ঘটনা ঘটে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন নতুনভাবে জীবন লাভের জন্য।

মরণোত্তর দেহদানের ব্যাপারে সমাজের সচেতনা জাগানোর উদ্যোগ জরুরি। বিশেষ করে আমাদের দেশে। ১২০ কোটি দেশের বহু মানুষের দেহে অঙ্গ পুনঃস্থাপন করলে তাঁরা নতুন জীবন ফিরে পাবেন। কিন্তু এখনও সামাজিক স্তরে তেমন সাড়া মিলছে না— এটা সমস্যা। মৃত্যুর পর যেসব দেহ সৎকারের মাধ্যমে ধর্ম রক্ষা হচ্ছে তার মধ্যেও আরও বড় মাপের কাজ সম্ভব এটা বোঝা দরকার। দেহদানের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই একটা মহৎ কাজে অংশ নিতে পারি এই উপলব্ধি আজ জরুরি।

অঙ্গদানের রীতিনিয়ম :

১. অসুস্থ মানুষের দেহে কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব সদ্য মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ নিয়ে।

২. একজন অঙ্গদাতার বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে সাতটি জীবন বাঁচানো সম্ভব।

৩. অনেক সময় কয়েকটি অঙ্গ গ্রহণ করা যায় না পুনঃস্থাপনের জন্যে, অঙ্গদাতার পরিবারের সম্মতি মেলে না। অঙ্গগুলি হলো : হৃদ্‌যন্ত্র, কিডনি দু'টি, লিভার, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াস, ক্ষুদ্রান্ত্র।

৪. জীবন-দানের অঙ্গগুলি দেওয়া যায় মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর।

দেহের যেসব টিসু দান করা যায়— চামড়া, হাড়, কর্নিয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের ভালব, শিরা।

দু'টি কর্নিয়া দেওয়া যায় দু'জন দৃষ্টিহীনকে।

হৃদ্‌যন্ত্রের ভালব ব্যবহার করা যায় শিশুদের হৃদযন্ত্র বদল করে। চামড়া লাগানো যায় পুড়ে যাওয়া ব্যক্তির চিকিৎসার প্রয়োজনে। হাড় পেশির কোনো কোনো অংশ কাজে লাগে অপারেশনের ক্ষেত্রে। ■

'তপোভূমি নৈমিষারণ্য'
যাত্রীনিবাস ও দর্শনের ব্যবস্থা আছে

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ডাক-নৈমিষারণ্য, জেলা-সীতাপুর
উত্তরপ্রদেশ, পিন-২৬১৪০২
(হরিদ্বারগামী ট্রেনে লখনউ অথবা হরদই স্টেশন থেকে যাওয়া যায়)

তীর্থযাত্রী নিবাস ও মন্দির নির্মাণকল্পে আপনার দান প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে সাদরে গৃহীত হবে।

স্বামী ত্রিগুণানন্দ
ফোন-০৯৯৩২৯০৬৮৮১
০৯৪৪১৪৩১৯২০

ছোট্ট যোগগুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পৃথিবীকে দেওয়া ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার যোগ (Yoga)। আমাদের জীবনকে আয়ু, প্রসন্নতা ও আনন্দে ভরে দেওয়ার বিজ্ঞান। বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে যোগের উপযোগিতা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। পাশ্চাত্য জগৎ আজ যোগের মহিমা উপলব্ধি করে তার ব্যাপক অনুশীলন শুরু করেছে। ইদানীংকালে বাবা রামদেবের প্রচেষ্টায় ভারতের ঘরে ঘরে যোগভ্যাস চলছে। শিশুরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই।

বিহারের খগড়িয়াবাসী ১২ বছরের ছোট্ট মেয়ে শ্রেয়া ত্যাগী ১৫১টি যোগাসন ও ২১টি প্রাণায়াম খুব নিখুঁত ভাবে দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে; অন্যকে শেখাতেও পারে। এজন্য যোগগুরু বাবা রামদেব শ্রেয়াকে 'খুকি যোগগুরু' উপাধি দিয়েছেন। বাবা রামদেব যখন বিহারে আসেন তখন শ্রেয়ার সঙ্গে দেখা করতে ভুল হয় না।

বিহারের প্রখ্যাত যোগাচার্য ধর্মেন্দ্র ত্যাগীর কন্যা শ্রেয়ার জন্ম ২০০২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। শিশুকালেই বাবাকে প্রতিদিন যোগাভ্যাস করতে দেখে শ্রেয়া অনুকরণ করতে থাকে। মাত্র দু'বছর বয়সেই যোগাসন দেখিয়ে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় শিবিরে পুরস্কার পায়।

শ্রেয়ার বাবা ধর্মেন্দ্র ত্যাগী বলেন— যোগাসনের জন্য শ্রেয়ার নাম গিনিস্ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্-এ না উঠুক, কিন্তু এই 'যোগকন্যা' অনেক রাজ্যে যোগাসন প্রদর্শন করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে সবচেয়ে কম বয়সে সে শিশু পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর।

খগড়িয়ার এস এল ডি এ ভি স্কুলে সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়ার নিপুণতার সঙ্গে যোগাসন করা দেখে বাবা রামদেব ভাগলপুরের সেন্ট জোসেফ স্কুলে একটি যোগশিবিরে আসার আহ্বান জানান। সেখানেই তিনি শ্রেয়াকে 'খুকি যোগগুরু' নামে অভিহিত করেন। শ্রেয়ার বাবা বলেন— শিশুকাল থেকে যোগাসন নকল করলেও দু'বছর বয়স থেকে সে যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে আসন করতে তাঁর নিজের অসুবিধা হোত তা শ্রেয়া অবলীলায় করে দেখাতো। তখনই তিনি তাকে তৈরি করতে শুরু করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্রেয়া যোগাসনে দক্ষতা অর্জন করতে থাকে।

যোগাসনের বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রেয়া প্রবচন দিতে পারে। প্রবচনে সে যখন বলে ''মনুষ্য জীবন একটি যুদ্ধ, তাতে যাঁর আত্মশক্তি বেশি তিনিই জয়লাভ করেন। আত্মশক্তি সত্যের অপর নাম'' তখন তাকে কোনো বিদুষী বলে মনে হয়। গাম্ভীর্য কমিয়ে আবার যখন বলে—''বেশিরভাগ রোগ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি। ভুল খাদ্য-পানীয়, খারাপ আচার-ব্যবহার ও ভুল দিনচর্যা আমাদের সমস্ত রোগের কারণ। সমস্ত রোগব্যাধি যোগ-প্রাণায়ামের দ্বারা দূর করা যায়। একশ' রোগের একটি ওষুধ যোগাসন''— তখন মনে হয় একজন অভিভাবক আমাদের পাঠ পড়াচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, ছোট্ট শ্রেয়া হঠযোগও আয়ত্ত করেছে। মানুষ আশ্চর্যচকিত হয়ে যায় যখন দেখে সে নিজের বুকের ওপর চারথান ইঁট রেখে হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। একজন প্রশিক্ষিত জিমনাস্টের মতো শ্রেয়া তার শরীর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে ঘুরানোর ক্ষমতা রাখে।

ইতিমধ্যে শ্রেয়া এক ডজন পুরস্কার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছে। তার বাবা গর্বের সঙ্গে বলেন— 'কঠিন কঠিন যোগাসন যেমন— বৃশ্চিকাসন, দ্বিপাদ শিরাসন, গর্ভাসন, পক্ষীআসন, সর্বাঙ্গাসন, পূর্ণ ভুজঙ্গাসন ও মৎস্যাসন শ্রেয়া খুব সহজে করে ফেলতে পারে।'' কয়েকদিন আগে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার, রাজস্থানের অশোক গেহলতের হাতে শ্রেয়া পুরস্কার নিয়েছে। এখন পর্যন্ত সে ১৫টিরও বেশি রাজ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

ভবিষ্যতে তোমার লক্ষ্য কি? প্রশ্ন করা হলে শ্রেয়ার উত্তর— ''জেলে কয়েদিদের, গরিব ও দুর্বল ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় যোগাসন শেখাতে চাই।'' ইতিমধ্যে বেগুসরাইয়ের জেলকর্তৃপক্ষ শ্রেয়াকে নিয়ে গিয়ে কয়েদিদের যোগ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। খগড়িয়া ডি এ ভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রেয়ার সম্পর্কে বলেন— ''শ্রেয়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রোল মডেল। স্কুলে যা কিছু হয় তাতে শ্রেয়ার অংশগ্রহণ থাকেই। অন্যদেরও সে উৎসাহিত করে।''

বস্তুত শ্রেয়া নিজে নিজেই অনেককিছু করে ফেলেছে, এখন তার প্রয়োজন সরকারের সহযোগিতা। কেননা বিশ্ব দরবারে তাকে ভারতের নাম উজ্জ্বল করতেই হবে। ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"এসো আমরা আশা রাখি, আমাদের নিজ মাতৃভূমি এবং স্বদেশবাসী, জগতের সামনে এমন এক সর্বশ্রেষ্ঠ, সুমহান এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আদর্শ স্থাপন করবে, যা সমগ্র বিশ্ব গ্রহণ করতে পারবে। একাজ করতে হলে সর্বপ্রথম আমরা যাতে প্রকৃত হিন্দু হতে পারি তারই চেষ্টা করতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল

অজিত কুমার বিশ্বাস

স্বাধীনতার পরে ভারতের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মার্কসবাদীদের হাতে। কংগ্রেসী সরকার ICHR তৈরি করার পর থেকে ২০ বছর চালিয়েছে কমিউনিস্টরা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখতে এগিয়ে এসেছেন বৈজ্ঞানিকরা। ভাবলে অবাক হতে হয় 'সরস্বতী নদীর উৎস সন্ধানে' বই লিখলেন ISRO-র বৈজ্ঞানিকরা। ঠিক তেমনিভাবে প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'বীরাঙ্গনা ময়নামতী' সম্পর্কে লিখেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যার মতো একটা বিষয়ে ডক্টরেট সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. শিশুতোষ সামন্ত। ড. সামন্তর লেখা ৪ খণ্ডে রানী রাসমণির অন্তহীন জীবনবৃত্তে বইটিও বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন।

ময়নামতী সম্পর্কে যা জানতাম তা একেবারেই সীমিত। আমরা ময়নামতী বললে বুঝতাম বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ময়নামতী ছিলেন একজন রানী যিনি চন্দ্রবংশের সর্বশেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মা। ড. সামন্ত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই পরিধি অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। বীরাঙ্গনা ময়নামতীর কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধি তথ্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ময়নামতীর সাহসিকতার ইতিহাস ও কিংবদন্তী তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে ভারতবর্ষ ও বাংলার সুপ্রাচীনকালের বীরাঙ্গনাদের ইতিহাস উদ্ঘাটন করে তাদের প্রতি ঐতিহাসিকরা সঠিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করেননি। এটা অতীব সত্য কথা। একাদশ শতাব্দীর চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন মানিকচন্দ্র। তাঁর রাজধানী ছিল প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের পাটিকারায় যা এখন কুমিল্লা জেলার 'পটিকার পরগনায়'। এই রাজা

মানিকচন্দ্রের ভারতপ্রসিদ্ধা স্ত্রীর নামই ময়নামতী এবং তার একমাত্র পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র।

ইতিহাস বলে, ময়নামতী শুধু রাজ্য পরিচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন না। তিনি তন্ত্রসাধনাতেও ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, এমন একজন মহীয়সী নারীর কথা বাংলা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের পাতায় কোনো স্থান নেই। সত্য কখনও মরে না। সেই সত্যের সন্ধান করেছেন ড. সামন্ত।

শৈশবে ময়নামতীর নাম ছিল শিশুমতী। উত্তর ভারতের বিখ্যাত সাধক গোরক্ষনাথের কাছে দীক্ষা নেন এবং তন্ত্রশিক্ষা করেন। গোরক্ষনাথের অন্য এক শিষ্য হাড়িপার কাছে ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্র তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আজও নাথ সম্প্রদায়ের কিছু মন্দিরে গোরক্ষনাথের সঙ্গে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের পূজা হয়। কলকাতার কাছে দমদমে গোরক্ষবাসী মন্দির আছে। আজও সেখানে গোরক্ষনাথ, রাজর্ষি সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ ও মাতা ময়নামতীর পূজা হয়। গোরক্ষনাথ, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের শিষ্যরা নাথ সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

হিন্দি নাথ সাহিত্যে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায়ও ময়নামতী ও গোপীচাঁদের নামে পাঁচালি, গান, ছড়ার মধ্য দিয়ে অনেক কথা ড. সামন্ত তুলে ধরেছেন।

লেখক অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করে ময়নামতীর কথা তুলে ধরেছেন। প্রায় ৬০টি চিত্র, ১৪টি বংশ তালিকা সম্বলিত পুস্তকটি অনেক পরিশ্রম করে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। বিজ্ঞান সাধক ড. শিশুতোষ সামন্ত 'বীরাঙ্গনা ময়নামতী' গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির মাধ্যমে ইতিহাসের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও বাংলার সুপ্রাচীন কালের নারীর ইতিহাস লেখায় এক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বীরাঙ্গনা ময়নামতী— ড. শিশুতোষ সামন্ত।
মহাবোধি বুক এজেন্সি,
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।
মূল্য : ১২৫ টাকা।

অখিল ভারতীয় সন্তচিন্তন বৈঠক

গত ২৪-২৫ নভেম্বর ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের তত্ত্বাবধানে অখিল ভারতীয় সন্তচিন্তন বৈঠক হয় উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনধামের কৃষ্ণকৃপাধাম আশ্রমে। উত্তরবঙ্গ থেকে ২ জন ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২ জন সন্ত এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

বৈঠকে কয়েকটি সংকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— □ হিন্দুদের সন্তানসংখ্যা বাড়ানোর জন্য সন্তগণ উপদেশ দেবেন। □ লাভ জেহাদ, ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে সচেতন ও সক্রিয় করা। □ কাশ্মীরে তীর্থ ভ্রমণ ও সিন্ধুদর্শন যাত্রায় উৎসাহিত করা। □ নেপালের সঙ্গে সাংস্কৃতিক একাত্মতা স্থাপনের জন্য সন্তসমাজ উদ্যোগী হবেন। □ 'সর্বধর্ম সমভাব' ও 'সর্বধর্ম সম্মেলন' কথা থেকে সমাজকে সতর্ক করা। □ দেশে উৎপন্ন সমস্ত ধর্ম, মতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। □ সৎসঙ্গ, প্রবচন ও উপদেশের মাধ্যমে দেশের সমস্যা ও তার নিরাকরণের জন্য হিন্দু সমাজকে সচেতন করা। □ আশ্রম, মঠ-মন্দির ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে সমাজের ভালো কাজের জন্য প্রেরণা দেওয়া। □ সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন গো-সেবা, গো-পালন ও গো-সংরক্ষণের জন্য কাজ করা ও করানো। □ সমাজে ভেদাভেদ দূর করার নানারকম কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের সার্ধজন্মশতবর্ষ স্মরণে সংস্কার ভারতী ব্যান্ডেল শাখা সম্প্রতি আন্তঃজেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। রজনীকান্ত-রবীন্দ্র-নজরুল গানের প্রতিযোগিতায় বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন শুভদীপ নাগ ও সুদেষ্ণা রায়, নৃত্যে বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন মৌমিতা সেনগুপ্ত ও মধুমন্তী রায় এবং অঙ্কনে নিমাই দাস। সমস্ত প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সংস্কার ভারতী বীরভূমজেলা সংগঠক বিশিষ্ট সাংবাদিক তিলক সেনগুপ্তের পরিচালনায়। গত ৯ নভেম্বর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির প্রেক্ষাগৃহে পৌরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রশাসনিক প্রধান সুব্রত রায় এবং নীহাররঞ্জন সেনের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শৈবাল সেনগুপ্ত ও গৌরী সেনগুপ্ত।

মালদায় আলোচনা সভা

গত ৩০ নভেম্বর মালদা শহরের ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে শহরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মালদা নগরের উদ্যোগে এই আলোচনা সভাতে প্রধান বক্তা ছিলেন পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। তিনি শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং

সমাবেশ সমাচার

সমাজজীবনের শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ১৩০ জন শিক্ষক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন নগরের শিক্ষক নারায়ণ মণ্ডল।

'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৯ অক্টোবর দুবরাজপুর নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীরভূমের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম সংবাদদাতা বিশিষ্ট সমাজকর্মী রবীন্দ্রনাথ কবিরাজকে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। তাঁর বয়স ৮৯ বৎসর। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে দীপ প্রজ্জ্বলন করেন দুবরাজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের পূজ্যপাদ স্বামী সত্যশিবানন্দপুরী মহারাজ। দুবরাজপুর নগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান পালিত হয়। জেলার বহু সাংবাদিক সাহিত্যিক-সহ বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রী কবিরাজকে পদধৌত করে পূজা করেন তাঁর বড়বৌমা, পরে তাঁকে গীতা, বস্ত্র, উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন, কাকলি দাস ও অলকা গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণবিষ্ণু কবিরাজ পরিবার ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান। শান্তিমন্ত্র পাঠে অনুষ্ঠানের সামাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবীরভূম জেলার তেজহাটি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা নলহাটি মহকুমা সঙ্ঘচালক লক্ষ্মীনারায়ণ নাই (লক্ষ্মীদা) গত ৪ ডিসেম্বর সকালে পরলোকগমন করেন। তিনি তেজহাটি উচ্চবিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জেহাদী মৌলবাদমুক্ত বাংলা গড়তে

বিরাট হিন্দু সম্মেলন

বক্তা

শ্রী মোহন ভাগবত ☆ **শ্রী অশোক সিংহল**

(সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) *(বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংরক্ষক)*

ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া *(কার্যকারী সভাপতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)*

২০ ডিসেম্বর ২০১৪, শনিবার দুপুর ১২টা
স্থান ঃ শহীদ মিনার ময়দান, কলকাতা

আমরা সবাই হিন্দু

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গ, ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

দিল্লীতে গীতা জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'গ্লোবাল ইনস্পিরেশন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট অর্গানাইজেশন অব গীতা' এবং দিল্লীর কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা ভারতবর্ষের শাশ্বতবাণী শ্রীমদ্ভগবতগীতার ৫১৫১ জয়ন্তী উৎসব পালন করে। গত ২ থেকে ৭ ডিসেম্বর দিল্লীর লালকেল্লা ময়দানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতা প্রেরণা উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসরঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন— জাতি, পন্থ, ভাষা ও প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে আপন করে নেওয়ার আহ্বান আছে গীতায়। গীতার একটি অধ্যায়ের যে-কোনো একটি শ্লোকের অর্থ যদি আমরা আচরণে আনতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে। ভগবান গীতায় বলেছেন— 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' অর্থাৎ যে-কোনো কাজ যদি আমরা উত্তমরূপে করি তার উত্তম ফল পাওয়া যায়। সমত্বরূপ যোগই হলো কর্মের কৌশল বা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার উপায়।

তিনি মনে করিয়ে দেন— ১৮৫৭ সালের অনেক আগে থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রায় ১০০ বছর পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের জীবন আমাদের কাছে দীপস্তম্ভ স্বরূপ। ফাঁসীতে যাওয়ার সময় তাঁরা গীতার শ্লোক উচ্চারণ করেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তা জ্ঞানানন্দ বলেন— অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী যা মোক্ষদা একাদশী নামে পরিচিত, খুবই পবিত্র তিথি। কেননা এই পুণ্যতিথিতেই মানবসমাজের জন্য যুদ্ধভূমিতে দুই পক্ষের সেনার মাঝে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে নিমিত্ত রেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানব সমাজের জন্য গীতা উপদেশ দান করেন। জ্ঞানানন্দ আরও বলেন, ২ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। কেননা আজ শ্রীমদ্ভগবতগীতার ৫১৫১ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই ঐতিহাসিক দিনটি ঐতিহাসিক স্থান লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত হয়ে বিশ্বের প্রেরণার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

গীতা জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা জানান যে গীতাজয়ন্তীর দিন সারাদেশে বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে নানারকমের অনুষ্ঠান হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর শিশু ও যুবচেতনা কার্যক্রম হয়েছে। ওইদিন যুবশক্তি জাগরণ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন, রাষ্ট্রনির্মাণ, স্বচ্ছতা অভিযান এবং পিতামাতা ও গুরুজনদের সম্মান বিষয়ক নানাবিধ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

৭ ডিসেম্বর লালকেল্লার মাঠে দেশের পূজ্য সাধুসন্তরা উপস্থিত হয়ে বার্তা দিয়েছেন— গীতা কেবল পূজা করার জন্য অথবা মৃত্যুর সময় পাঠ করার গ্রন্থ নয়, গীতা পাঠ করে সেই মতো আচরণ করে জীবন গঠন করাই উদ্দেশ্য। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন— প্রতিটি বিদ্যালয়, অফিস, চিকিৎসালয়, আদালত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে গীতার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ইন্দ্রেশকুমার বলেন— আজকের দিনে গীতার প্রেরণায় জীবন গঠন করে সমাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে জরুরি। ■

গীতা জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ও সাধু-সন্তগণ।

অণুনাটক—এক নতুন ভাবনা

বিকাশ ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অভিনয়কাল পাঁচঘণ্টা কি চারঘণ্টা সময় থেকে কমতে কমতে এখন খুব বেশি দুই থেকে আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই সময়, যখন কলকাতার রাস্তায় দিনের প্রথম ট্রাম টং টং আওয়াজ করে রাস্তায় বের হোত বা বিরাট বড় পাইপ দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মীরা রাস্তায় জল দিত— তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে যবনিকা পড়ত। তখন সারারাতের অভিনয় দেখার পর ভোর ভোর যাতে দর্শকেরা রাস্তায় বের হতে পারে তার জন্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের আগে, মাঝে বা শেষে ছোট মাপের কিছু চুটকি, পঞ্চরঙ, কৌতুকনক্সাও হোত। এই দাবি মিটিয়েই গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বা অর্ধেন্দুশেখর বেল্লিকবাজার, বড়দিনের বক্‌শিশ্‌, মুস্তাফী সাহেবকা পাক্কা তামাশা-র মতো প্রচুর ছোটমাপের নাটিকা লিখেছেন।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি এসেছে একাঙ্ক নাটক। একাঙ্ক নাটকের শিল্পিত রূপের উন্মেষ ঘটেছিল প্রধানত ঊনবিংশ শতকে। বাংলা ছোট গল্পের মূল কথাটি যেমন একক প্রতীতি (সিঙ্গল ইম্প্রেসন) একাঙ্কেরও তাই। বিস্তার-বিহীনতা ও বাহুল্যবর্জন তার প্রধান লক্ষণ। স্বল্প চরিত্র, মিতায়তন, এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকই হলো একাঙ্ক নাটক। সময়সীমা ৪০ থেকে ৬০ মিনিট। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গীয় প্রহসন', মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক', বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' বা বাদল সরকারের 'শনিবার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি এই পরিসরে, নাট্যপ্রবাহের এক নতুন ভাবনার কথা উল্লেখ করব। ১৯৮০ সালে Actor Theatre of Lnisvilla, 'The Humana Festival of New American Plays' নামে যে ১৫ মিনিটের নাটকের এক উৎসবের আয়োজন করেছিল, সেটাই ছিল বাংলা নাট্যজগতের নাট্যকারদের নতুন ভাবনার ইন্ধন। থিয়েটারের এই নতুন উত্তেজক আঙ্গিক প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের সঙ্গে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। প্রায় সব বিদেশী নাট্যকারেরা এই অণুনাটক রচনায় পরম উৎসাহে নিজেদের অঙ্গীভূত করলেন। ওই বিবর্তন সময়েরই দান। একুশ শতকের এই সময়ে যখন জীবন জটিল থেকে আরও জটিল হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে মানুষ। সেই গতিময় সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য শিল্প-সাহিত্য থেকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও আজ নতুনের ডাক। তাই পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারেরা রচনা করছেন ১৫ মিনিটের অণুনাটক এবং মঞ্চস্থও হচ্ছে সেসব।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "অণুনাটক আয়তনে ছোট হলেও তাকে সম্পূর্ণ নাটক হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ একটি বড় মাপের বা ১ ঘণ্টার একাঙ্ক নাটক যে যে শর্ত মেনে, যে structure অনুসরণ করে রচিত হয়— অণুনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও এই নাট্যধর্ম বজায় রেখেই তাকে চলতে হবে। তবে গঠনের সব দিকটাতেই একটা দ্রুততা থাকবে। অথচ দর্শক যেন না ভাবেন নাট্য বিষয়টিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা খুব শক্ত কাজ। একারণেই অণুনাটক একটা Challanging dramatic format যা দু' ঘণ্টা বা এক ঘণ্টায় বলা যায় তা ১৫ মিনিটে বলব— এটাই Challange."

অণুনাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে অণুনাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়েও কিছু আলোচনা করা যাক। অণুনাটক অভিনয় অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তার উপযোগিতার কারণে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় অণুনাটকের প্রযোজনা অনেক বেশি গতিময়। পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গতিসম্পন্ন নাট্যদল ব্যয়বহুল মঞ্চসজ্জা, আলোর কারসাজি ও সঙ্গীত প্রয়োগের মাধ্যমে দর্শকদের চমৎকৃত করার প্রয়াস পান। সেক্ষেত্রে অণুনাটকের মঞ্চভাবনা প্রযোজনার বিশেষত্বের কারণেই অনেক হালকা, স্বল্প অথচ ব্যঞ্জনাময় হয়।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, একই অভিনেতা একসঙ্গে ১০/১৫টি দলে মুখ্য অভিনেতার ভূমিকা পালন করছেন। একই পরিচালক ৪/৫টি দলে গিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন। অন্যেরা আসে যায়। অণুনাটক প্রযোজনায় একই দল একই মঞ্চে একাধিক পরিচালক ও অভিনেতাদের সুযোগ দিতে পারে। ফলে দলের সদস্যদের দলের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ে। সুযোগের অপেক্ষায় প্রতিভার অপচয় রোধ করে— অণুনাট্যের প্রযোজনা। ■

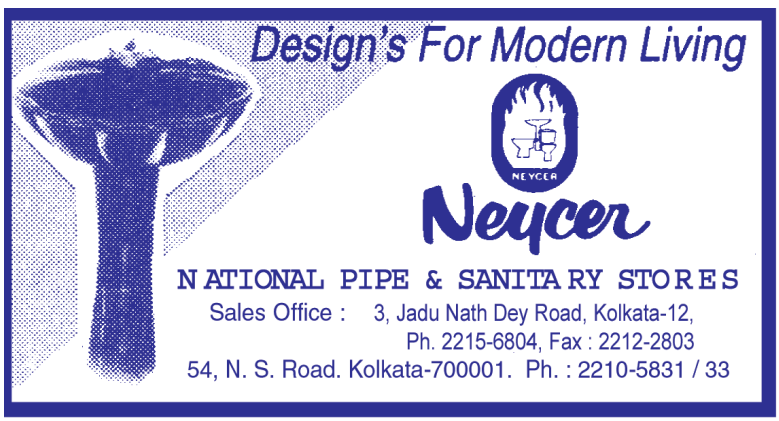

শব্দরূপ-৭৩১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

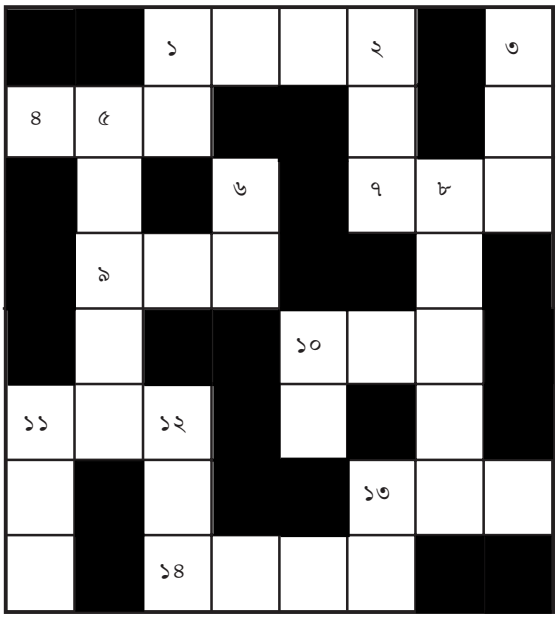

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মহালয়া থেকে কালীপুজোর আগেরদিন পর্যন্ত যখন দেবী দুর্গার আরাধনা হয়, **৪.** গোবর, **৭.** সঙ্গীতের তাল বিশেষ, **৯.** যযাতির পিতা, **১০.** সুগন্ধ শাক বিশেষ যা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, **১১.** সাধু সন্ন্যাসীর বাসস্থান, **১৩.** বৃক; একটি হিংস্র পশু, **১৪.** 'যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ—

উপর-নীচ : ১. দানের যোগ্য, **২.** রাত্রি, **৩.** কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধ কালকেতুর পত্নী, **৫.** বেদান্তবিরোধী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত— শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কে পরাজিত, **৬.** ভেড়া; রাশিচক্রের প্রথম রাশি, **৮.** সেনাপতি; দণ্ডবিধানকর্তা, **১০.** যযাতি শর্মিষ্ঠার পুত্র, **১১.** সূর্য; অদিতি-কাশ্যপের দ্বাদশপুত্র, **১২.** বাঁশি, **১৩.** মনসামঙ্গলে মনসার সহকারিণী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

■	■	আ	গ	ম	নী	■	অ
বি	পা	শা	■	■	র	■	ঙ্গু
■	স্থ	■	ব	■	ব	শি	ষ্ঠ
■	পা	থা	লি	■	■	শ	■
■	দ	■	■	প	র	ম	■
দু	প	র	■	দ্মা	■	হ	■
র্বা	■	ক্ষ	■	■	স	ল	তে
সা	■	ক	লা	ব	তী	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৩১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Sree Radhakrishna Store
Hosiery Manufacturers & Wholesellers
160, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mob. 9433013838, Ph. (033) 2268-4840

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

আরব সাগরে ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটে 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র পর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর স্ট্যাচু। গুজরাটে নির্মীয়মান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চ মূর্তিকে পৃথিবীর সব থেকে বড় মূর্তি বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এবার তার থেকেও বড় হিসাবে নির্মিত হচ্ছে ছত্রপতি শিবাজীর ১৯৩ মিটার উচ্চতার মূর্তি। মহারাষ্ট্রের আরব সাগরে গড়ে তোলা হচ্ছে মারাঠা বীর যোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তি। জানা যায়, ২০০৪ সালে কংগ্রেস-এনসিপি জোট বিধানসভা ভোটে সাধারণ মানুষের কাছে এই মূর্তি গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন-এর পরে তা আর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা জোট ক্ষমতায় এসে সেই কাজ শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিবেশ এবং বনমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজী'র মূর্তি ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলার জন্য সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও জানান, মূর্তি নির্মাণের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং বাকি নামমাত্র যেটুকু কাজ বাকি রয়েছে তা খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে। সূত্র মারফত আরও জানা যায়, গত মাসে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাভড়েকরের সঙ্গে দেখা করে আরব সাগরের উপর এই প্রস্তাবিত প্রকল্প নির্মাণের জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই দেওয়ার অনুরোধ জানান। মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের পরই সপ্তদশ শতকের এই মহান যোদ্ধার মূর্তি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রস্তাব গ্রহণ করে চাইছিল মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার। এন সি পি নেতা জয়ন্ত পাটিল বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি গত জুন মাসে জাভড়েকরের সঙ্গে দেখা করে যাতে যথাশীঘ্র এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় সে ব্যাপারে অনুরোধ জানান।

আরব সাগরে একটা শিলাখণ্ডের উপর ১৫.৯৬ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠতে চলেছে এই প্রকল্প। রাজভবন থেকে যার দূরত্ব ১.২ কিলোমিটার। আবার এইচ টু ও (H_2O) জেটি থেকে এর দূরত্ব ৩.৬ কিলোমিটার। নরিম্যান পয়েন্ট থেকে এর দূরত্ব ২.৬ কিলোমিটার। জানা যাচ্ছে, ১৯৩ মিটার উচ্চতার এই মূর্তি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মূর্তি হিসাবে চিহ্নিত হতে চলেছে, যা বিশ্বের কাছে এক অন্যতম আশ্চর্যের নিদর্শন হবে। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
15 December - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা